ফয়যানে মদীনা

জুন ২০২৪

Translated by:
Translation Department
(Dawat-e-Islami)

ফয়যানে মদীনা

জুন ২০২৪

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন

হযরত ইব্রাহিম عليه السلام কে স্মরণ করো (পর্ব : ০১)

মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

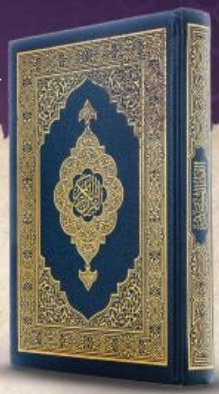

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۘ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং কিতাবে ইব্রাহীমকে স্মরণ করো! নিশ্চয় সে অতীব সত্যবাদী ছিলো, (নবী) অদৃশ্যের সংবাদদাতা। (পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৪১)

তাফসীর: আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ তিনি হলেন আল্লাহর নবী, রাসূল, নৈকট্যশীল ও প্রিয় বান্দা। আল্লাহর দরবারে সমাদৃত লোকদের স্মরণ করার একটি রহস্য হলো "নেয়ামতে ইলাহী " কেননা সুখ্যাতি, উত্তম চর্চা এবং প্রশংসা ও গুণাবলী আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর নেয়ামত, কারণ আল্লাহ পাক মানুষের হৃদয়ে তাঁর ভালবাসা এবং জিহ্বায় আলোচনা স্থাপন করে দেন। আল্লাহর দরবারে সমাদৃত লোকদের স্মরণ করার দ্বিতীয় রহস্য হলো: তাঁদের চরিত্র, নৈতিকতা এবং সদাচরণের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করা, কারণ কামিলকে (পরিপূর্ণ) অনুসরণ করা একজন ব্যক্তিকে কামিল (পরিপূর্ণ) করে তোলে। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام উচ্চ পর্যায়ের কামিলুল ঈমান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আসুন! পবিত্র কুরআনের নির্দেশ (وَاذْكُرْ এবং স্মরণ করো) এর উপর আমল করে পবিত্র কুরআনের আলোকে তাঁকে স্মরণ করি।

একজন কামিল মু'মিন বান্দার অসংখ্য গুণাবলী থাকে, যা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সুস্পষ্ট, যেমন; পূর্ণ ঈমান, একত্ববাদের উপর দৃঢ়তা, খোদার ভালোবাসা, সত্য বাস্তবায়ন ও মিথ্যা বর্জন এবং আল্লাহর দিকে লোকদেরকে আহ্বান করা, পরীক্ষার সম্মুখীন, প্রাণ, সম্পদ, সন্তান সন্ততির কুরবানী, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, সহনশীলতা এবং সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যক্তিত্বে এসব গুণাবলী পরিপূর্ণরূপে রয়েছে।

পপিূর্ণ ঈমান:

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় সে আমার উন্নততর মর্যাদাপূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (পারা: ২৩, সূরা: সাফফাত, আয়াত: ১১১)

একত্ববাদের উপর দৃঢ়তা:

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর জাতির লোকেরা মূর্তি পূজা ছাড়াও নক্ষত্র, চন্দ্র

ও সূর্য্যের পূজা করতো। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام সেই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করে জাতির সামনে প্রকাশ্যে একত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, আমি ঐ সকল বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণ, যাদেরকে হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা খোদার অংশীদার করো কুরআন মাজিদ তা এভাবে বর্ণনা করেছে:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿۷۶﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿۷۷﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۷۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন তাঁর উপর রাতের অন্ধকার নেমে আসলো তখন একটা নক্ষত্র দেখলেন বললেন: 'এটাকেই কি আমার প্রতিপালক স্থির করছো?' অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন বললেন: 'আমি পছন্দ করিনা যা অস্তমিত হয়।' অতঃপর যখন চাঁদকে চমকিত অবস্থায় দেখলেন তখন বললেন: 'এটাকেই কি আমার প্রতিপালক স্থির করছো?' অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন বললেন: 'যদি না আমাকে আমার প্রতিপালক হিদায়াত করতেন, তবে আমিও সেই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।' অতঃপর যখন সূর্যকে ঝিলিমিলি করতে দেখলেন, তখন বললেন: 'এটাকে কি আমার প্রতিপালক বলছো? এটাতো সেগুলো অপেক্ষা বড়।' অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন বললেন: 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি অসন্তুষ্ট সেসব বস্তুর প্রতি যেগুলোকে তোমরা শরীক স্থির করছো। (পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ৭৬-৭৮)

সত্য বাস্তবায়ন ও মিথ্যা বর্জন:

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর জাতি কেবল মুশরিক এবং মূর্তিপূজক ছিলো না, বরং পাগলের ন্যায় মূর্তিকে পছন্দ করতো, কিন্তু তিনি عَلَيْهِ السَّلَام সকল প্রকার তিরস্কার ও সংশয় থেকে নির্ভয় হয়ে এবং আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ আস্থার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে একবার নয়, বরং বারবার তাঁর জাতির সামনে একত্ববাদের সত্যতা ও মূর্তির মিথ্যা প্রভুত্বের বিষয় বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖۤ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿۲۶﴾ اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿۲۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যখন ইব্রাহীম নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বললেন: 'আমি তোমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট; তিনি ব্যতীত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং অবশ্য তিনি শীঘ্রই আমাকে পথ প্রদান করবেন। (পারা: ২৫, যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৭)

অন্যত্রে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام বলেন:

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۷۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি আমার মুখমণ্ডল তাঁরই দিকে করলাম, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই হয়ে এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই।

(পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ৭৯)

আল্লাহর প্রতি আহ্বান:

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আজীবন তাঁর মুশরিক জাতি এবং তাঁর পরবর্তী ঈমানদারদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তা হলো সত্য দ্বীনের দাওয়াত এবং এর জন্য তিনি তাঁর জাতিকে বুঝান, একটি জায়গায় তিনি বলেন:

اِذْ قَالَ لِاَبِیْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۷۰﴾ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِیْنَ ﴿۷۱﴾ قَالَ هَلْ یَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿۷۲﴾ اَوْ یَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ یَضُرُّوْنَ ﴿۷۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন সে আপন পিতা ও আপন সম্প্রদায়কে বললো: 'তোমরা কিসের পূজা করছো?' তারা বললো: 'আমরা প্রতিমাগুলোর পূজা করছি এবং সেগুলোর সম্মুখে আসন পেতে রয়েছি।' বললেন: 'সেগুলো কি তোমাদের কথা শুনতে পায়, যখন তোমরা ডাকো? অথবা তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করে?' (পারা: ১৯, সূরা: শুয়ারা, আয়াত: ৭০-৭৩)

তারপর আল্লাহ পাকের মহিমা বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন:

قَالَ اَفَرَءَیْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿۷۵﴾ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ﴿۷۶﴾ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّیْۤ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۷۷﴾ الَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَهُوَ یَهْدِیْنِ ﴿۷۸﴾ وَ الَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَ یَسْقِیْنِ ﴿۷۹﴾ وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْنِ ﴿۸۰﴾ وَ الَّذِیْ یُمِیْتُنِیْ ثُمَّ یُحْیِیْنِ ﴿۸۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বললেন: 'তোমরা কি দেখছো এ গুলোকে, যেগুলোর পূজা করছো, তোমরা ও তোমাদের পূর্বেকার পিতৃ-পুরুষেরা? নিশ্চয় এগুলো সবই আমার শত্রু; জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত; তিনিই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তিনি আমাকে পথ প্রদান করবেন এবং তিনিই, যিনি আমাকে আহার করান এবং পান করান; আর যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন; ও তিনি মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন।

(পারা: ১৯, সূরা: শুয়ারা, আয়াত: ৭৫-৮১)

এবং নমরূদের সামনে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام অনন্য উপায়ে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও একত্ববাদের কথা বর্ণনা করে একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, যেমনটি পবিত্র কুরআনে রয়েছে:

قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ یَاْتِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیْ كَفَرَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۲۵۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ইব্রাহীম বললেন: 'তাহলে আল্লাহ্ সূর্য উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে এসো! অতঃপর হতবুদ্ধি হয়ে গেলো কাফির এবং আল্লাহ্ সৎপথ দেখান না অত্যাচারীদেরকে।

(পারা:৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৫৮)

জান্নাতী পশু

মাওলানা মুহাম্মদ জাবেদ আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَكْرِمُوا النَّعَرَ يَ وَامْسَحُوا رَغَامَهَا عَنْهَا فَإِنَّهَا من دَوَابِّ الْجَنَّةِ অর্থাৎ: ছাগলকে সম্মান করো, তার থেকে মাটি ঝেড়ে দাও কেননা এটি জান্নাতী পশু। (মাজমা'উয যাওয়ায়িদ ৪/১১৩, হাদীস:৬২৫৩)

এখানে ছাগল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ছাগল জাতি (অর্থাৎ: ছাগল ছাগী, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি) ছাগলকে জান্নাতী পশু বলার কারণ হলো এটাই যে, এটি জান্নাত থেকে জমিনে অবতরণ করেছে বা কিয়ামতের পর জান্নাতে যাবে। (আত তাইসীর বিশরহে জামেউস সগীর, ১/২০৩)

আল্লাহ পাক অনেক মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকের নিজস্ব গুরত্ব ও উপকারীতা রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে একটি হলো ছাগল, ছাগল অনেক প্রিয় পশু, ছোট বড় সবাই তাকে পছন্দ করে।

প্রিয় বাচ্চারা! কুরবানীর ঈদে আমরা আল্লাহ পাকের নির্দেশে কুরবানী করি, কুরবানীতে অন্যান্য পশুর ন্যায় ছাগলকেও আল্লাহ পাকের রাস্তায় কুরবানী করা হয়। এসময় অধিকাংশ বাচ্চা কুরবানীর পশু নিয়ে চারপাশে ঘুরাফেরা করে।

কিন্তু কিছু বাচ্চা পশুকে কষ্টও দিয়ে থাকে, তাদের অধিক দৌড়াতে থাকে, বড় পশুকে নাকে দেয়া নাকিলকে (দড়ি) বিনা কারণে বারবার টেনে ধরে, আর এভাবে আরা অনেক কাজ করে যার দ্বারা পশুদের কষ্ট হয়ে থাকে।

প্রিয় বাচ্চারা! ছাগল হোক বা অন্য কোন পশু হোক তাকে কখনো কষ্ট দিবেন না, অধিক থেকে অধিকতর আরাম প্রদানের ব্যবস্থা করুন, ছাগল সম্পর্কে তো শুরুতে হাদীসে পাকের মধ্যে সুন্দর আচরণ করার প্রতি উসাহ প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং আপনিও এই হাদীসে পাকের উপর আমল করার সাথে সাথে ছাগলকে সম্মান করুন, তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকুন এবং হাদীসে পাকের বরকত অর্জন করুন।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে হাদীসে পাক পড়ে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী

(১) কিডনী (Donate) দান করার অসিয়ত করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের জীবদ্দশায় এই অসিয়ত করেন যে, আমার কিডনী দান করে দিবেন,তবে তার এই অসিয়ত করা কেমন? আর যদি কেউ অসিয়ত না করে, অসিয়ত ব্যতীত ঐ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ তার মৃত্যুর পর তার শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যেঙ্গ যেমন চোখ বা কিডনী কাউকে দান করে দেয় তবে তাদের এমন করাটা কেমন?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

প্রথমত এই কথাটা মনে রাখা উচিত যে, অসিয়ত ঐসব জিনিসের ব্যাপারে করতে পারবে, মানুষ স্বয়ং যেটার মালিক এবং যে জিনিসের মালিক অন্য কাউকেও বানানো যেতে পারে আর মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না সম্পদ আর না মালিকানাধীন অংশ, সুতরাং অন্য কাউকে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মালিক বানাতে পারবে না। এমনকি মানুষ নিজের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর নিজের সমস্ত অংশ দ্বারা সম্মানিত, তাই তার কোন অঙ্গ কেটে তা ব্যবহার করা এবং তার দ্বারা অন্য কাউকে উপকার করা নাজায়িয ও হারাম। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি নিজের জীবদ্দশায় এই অসিয়ত করলো যে, মৃত্যুর পর তার কিডনী বা তার শরীরের কোন অঙ্গ হতে কোন অঙ্গ দান করে দিতে, তো তার এই অসিয়ত করা এবং ওয়ারিশদের জন্য তার অসিয়ত বাস্তবায়ন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়িয, যদি ওয়ারিশগণ এই অসিয়ত বাস্তবায়ন করে বা অসিয়ত ব্যতীত নিজেরাই তার শরীরের কোন অঙ্গ দান করে দেয় তাহলে তারা বড় গুনাহগার হবে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) ইহরামের নিয়্যত করেছে কিন্তু তালবিয়া পাঠ করতে ভুলে গিয়েছে?

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে,কেউ নিজ দেশ হতে মক্কা মুকাররমা যাওয়ার সময় মীকাত হতে ইহরামের নিয়্যত করে নিয়েছিল কিন্তু তালবিয়া পাঠ করতে ভুলে গিয়েছে এবং মীকাতে প্রবেশ করেছে অতঃপর প্রবেশ করার পর মসজিদে আয়েশা হতেই ইহরামের নিয়্যত করলো এবং তালবিয়া পাঠ করে ওমরা করে নিলো তবে এর হুকুম কি?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত প্রশ্নে! নিয়্যতের সাথে যদি ঐ ব্যক্তি তালবিয়া ছাড়া আল্লাহ পাকের কোন যিকিরও না করে যাতে আল্লাহ পাকের মহত্ব রয়েছে যেমন (سُبْحٰنَ اللّٰه ইত্যাদি) তাহলে তার উপর দম দেয়া ওয়াজিব, কেননা ইহরাম বেঁধে প্রবেশ করার জন্য ইহরামের নিয়্যত ও তালবিয়া পাঠ করা বা আল্লাহ পাকের এমন মহিমা বর্ণনা করা (যেমনঃ سبحٰن الله والحمد لله) আবশ্যক, উল্লেখিত অবস্থায়! ঐ ব্যক্তির তালবিয়া পাঠ করা ভুলে যাওয়া এবং আল্লাহ পাকের মহিমা পূর্ণ কোন যিকিরও সেই করেনি, সুতরাং সেই মুহরিম নয়, এই ইহরাম ব্যতীত মীকাতে প্রবেশ করার কারণে তার উপর হজ্জ বা ওমরা ও দম দেয়া ওয়াজিব। এমতাবস্থায় তার উপর আবশ্যক যে, ওমরা শুরু করার পূর্বে কোন আফাকী মীকাতে (যেমনঃ তায়েফ বা মদীনা শরীফের মীকাত) গিয়ে পুনরায় ইহরামের নিয়্যত করে এবং সাথে তালবিয়াও পাঠ করে ইহরাম বাঁধবে ও ওমরা আদায় করবে, যদি সেই এমনটাই করে নেয় তাহলে তার দম দেয়া রহিত হয়ে যাবে কিন্তু সেই হিল থেকে ইহরামের

নিয়্যত ও তালবিয়া পাঠ করে ওমরা আদায় করে নিলে তো এমতাবস্থায় তার উপর দম দেয়া আবশ্যক ও নির্ধারণ হয়ে গিয়েছে। তাই এই বছর ওমরা করে নেয়ার দ্বারা তার উপর আবশ্যকীয় ওমরাও আদায় হয়ে গিয়েছে যদিও সেই বিশেষত ঐ আবশ্যক হওয়া ওমরার নিয়্যত না করে তবে প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো পবিত্র স্থানকে সম্মান করা যা যেকোন প্রকারের হজ্জ বা ওমরা দ্বারা অর্জন হয়ে থাকে, সেটা হিল থেকে ইহরাম না বাঁধলেও আফাকী (সর্বসাধারণের) মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার যে আবশ্যকতা ছিলো তা দম দেয়ার কারণে পূরণ হয়ে যাবে।

সতর্কতা: এই মাসআলার ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি এই বছর কোন প্রকারের হজ্জ বা ওমরা আদায় না করে তাহলে পরবর্তী বছর বিশেষত ঐ (মীকাত হতে ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করার কারণে আবশ্যকীয়) হজ্জ বা ওমরা আদায় করার নিয়্যতে হজ্জ বা ওমরা করাটা ওয়াজিব হবে, এখন এই ফরয হজ্জ বা ওমরা অন্য কোন হজ্জ বা ওমরার সাথে সম্পৃক্ত করলে আদায় হবে না কেননা বছর অতিবাহিত হওয়ার কারণে এই ওমরা বা হজ্জ কাযা হিসাবে আদায় করাটা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে আর কাযা আদায়ের নিয়্যত করাটাও জরুরী। তাই এমতাবস্থায় হজ্জ ও ওমরার কাযা আদায় করার জন্য যদি এই ব্যক্তি হিলে থাকে তাহলে তার ওমরার ইহরাম হিল থেকে হবে, আর যদি সেই মক্কায় থাকে তাহলে হিল থেকে ওমরার ইহরাম ও হেরম থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধা তার জন্য যথেষ্টে হবে।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(৩) তাওয়াফের পর দুই রাকাত পড়া ব্যতীত দ্বিতীয় তাওয়াফ করা ?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায আদায় করা ব্যতীত দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করার বিধান কী? এক্ষেত্রে যদি কেউ এমটাই করে তাহলে কি তার উপর দম বা কাফফারা ওয়াজিব হবে?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায আদায় করা ওয়াজিব, যদি মাকরূহ সময় না হয় তাহলে তাওয়াফ ও ঐ দুই রাকাতের সাথে মিলানো (অর্থাৎ তাওয়াফের পর পরই দুই রাকাত নামায আদায় করা) সুন্নাত, সুতরাং মাকরূহ সময় ছাড়া এক তাওয়াফের রাকাত আদায় করা ব্যতীত দ্বিতীয় তাওয়াফ করা মাকরূহ ও সুন্নাতের পরিপন্থি, কেননা এক্ষেত্রে তাওয়াফ ও দুই রাকাতের সাথে মিলানো সুন্নাত পরিত্যাগের বিষয়টাও অবশ্যই আসবে, এতদাসত্ত্বে এই কারণে কোন দম বা কাফফারা আবশ্যক হবে না, হ্যাঁ যদি মাকরূহ সময় হয় তাহলে দুই রাকাত নামায আদায় করা ব্যতীত দ্বিতীয় তাওয়াফ করাটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(৪) জুমার নামাযের ক্ষেত্রে সাহু সিজদা করে নেয়ার হুকুম ?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ে শরহে মতিন এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, এই মাসআলা তো জানা আছে যে, জুমা ও দুই ঈদের মধ্যে জমায়েত (লোক সমাগম) বেশি হলে তখন সাহু সিজদা আদায় করার ক্ষেত্রে সাহু সিজদা ত্যাগ করার নির্দেশ রয়েছে ? জানার বিষয় হলো এটাই যে, এমতাবস্থায় যদি সাহু সিজদা করে নেয়, তাহলে এর হুকুম কি? নামায কি হয়ে যাবে নাকি হবে না?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জুমা ও দুই ঈদের ক্ষেত্রে জমায়েত (লোক সমাগম) বেশি হলে তখন সাহু সিজদা আদায় করার ক্ষেত্রে পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামের গ্রহণযোগ্য মতামত হলো এটাই যে, সাহু সিজদা দিবে না কিন্তু এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সাহু সিজদা দেয়াটা নাজায়িয বরং উদ্দেশ্য এটাই যে, না দেয়াটা উত্তম, সুতরাং জুমা বা দুই ঈদের জমায়েতে (লোক সমাগম) বেশি হওয়ায় সাহু সিজদা করে নিলো, তবে এটা যদিও উত্তম নয় কিন্তু এর দ্বারা নামাযের কোন ক্ষতি হবে না বরং নামায সঠিক ও বিশুদ্ধ হবে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা

মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী

তালাকে রযঈ কি ইদ্দতের পর তিন তালাকে পরিণত হবে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম কি বলেন, তালাক সম্পর্কিত নিম্ন লিখিত প্রশ্নের ব্যাপারে:

(১) মহিলার এক তালাক পূর্ণ হওয়ার পরও কি তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে? অথচ সন্তানও আছে এবং তালাক পতিত হওয়ার দীর্ঘ সময় পূর্বে থেকে প্রত্যেক মহিলা স্বামীর সাথে ঝগড়া করে নিজে নিজেই পিতামাতার ঘরে থাকতে শুরু করে, সুতরাং এমতাবস্থায় মহিলা ভরণ পোষণের অধিকারী হবে কি হবে না?

(২) যদি মহিলাকে একটি তালাকে রযঈ দিয়ে দেয়া হয় এবং স্বামী কথায় ও কার্যতভাবে রুজু (ফিরে না আসে) না করে এবং তালাকের ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তো ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হওয়ায় এক তালাক তিন তালাকে পরিণত হয়ে যাবে নাকি এক তালাকই গণনা করা হবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

(১) যদি স্বামী নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দেয় তবে তার এক তালাকের পরও মহিলার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব, কেননা বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিবাহ ভঙ্গ হওয়ার পর মহিলার বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া আর একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করাকে ইদ্দত বলো।আর এটা এক তালাকের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়,

সুতরাং ভরণ পোষণের ব্যাপারে নির্দেশ হলো এটাই যে, যদিও সাধারণত স্ত্রীরা ইদ্দতের মাঝে স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের পিতামাতার ঘরে থাকে এবং স্বামীর ঘরে শরয়ী সীমাবদ্ধতা ও বিধিনিষেধ মেনে ইদ্দতের সময় অতিবাহিত করার জন্য রাজি হয় না, তাই এমন মহিলা শরীয়তের দৃষ্টিতে অকৃতজ্ঞ, স্বামীর উপর এমন মহিলার ইদ্দতের ভরণপোষণ আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে যদি সেই ফিরে এসে স্বামীর ঘরে ইদ্দত পূর্ণ করে তাহলে স্বামীর উপর বাকী ইদ্দতের সময়ের ভরণপোষণ আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

মনে রাখবেন! যদি তালাক প্রাপ্তা মহিলা স্বামীর ঘরে ইদ্দত অতিবাহিত করতে চাই কিন্তু স্বামী স্বয়ং নিজেই স্ত্রীকে নিজের ঘরে ইদ্দতের সময় অতিবাহিত করতে দেয় না, তবে এমতাবস্থায় স্বামীর উপর স্ত্রীর ইদ্দতের সময়ের ভরণপোষণ আদায় করা ওয়াজিব,আর যদি আদায় না করে তাহলে গুনাহগার হবে।

(২) ১ তালাকে রযঈ পতিত হওয়ার পর যদি ইদ্দতের মধ্যখানে স্বামী কথায় ও কর্যতভাবে ফিরে না আসে তাহলে ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর তালাকে রযঈ তালাকে বায়েনাতে পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং স্ত্রী স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর ঐ তালাক গণনার ক্ষেত্রে এক তালাকই পতিত হবে, তিন তালাকে পরিবর্তন হবে না। সুতরাং যদি স্বামী এই মহিলাকে তার সন্তুষ্টিতে নতুন মহর নির্ধারণ করে বিবাহ নবায়ন করে নেয় তাহলে এখন স্বামী শুধু বাকী দুই তালাকেরই অধিকারী হবে।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দশ হাজার বার ইয়া রহমান পাঠ করার মান্নত করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কেরাম ও মুফতীয়ানে দ্বীন এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আমার সন্তান অসুস্থ ছিলো, তখন আমি মান্নত করলাম যে, যদি সেই ভালো হয়ে যায় তাহলে দশ হাজার বার يَارَحْمٰن ইয়া রহমানু যিকির করবো, এখন اَلْحَمْدُ لِلّٰہ আমার সন্তান সুস্থ হয়ে গিয়েছে, তো এখন এই মান্নত পূর্ণ করা কি ওয়াজিব নাকি নয়?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

মান্নত ওয়াজিব হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো এটাই যেই কাজের জন্য মান্নত করা হয়েছে তা সাদৃশ্য পূর্ণ কোন ফরয বা ওয়াজিব হওয়া, অথচ ইয়া রহমান" এর যিকির এমন একটি কাজ যার মধ্যে (নামাযের মতো) সাদৃশ্য পূর্ণ কোন ফরয বা ওয়াজিব বিদ্যমান নেই, সুতরাং জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আপনার উপর দশ হাজার বার ইয়া রহমানু পাঠ করা শরয়ী দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়, পাঠ না করলে কোন গুনাহ নেই কিন্তু পাঠ করলে ভালো হবে এবং সাওয়াবের কারণ হবে।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

অনুকরণকারী প্রেমিক হয়ে গেলো

মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা! সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা পড়ে বা শ্রবণ করে আমাদের শুধু ঈমানী শক্তি এবং শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যই লাভ হয় না বরং এছাড়াও আমরা মুজিযার প্রেক্ষাপটে দ্বীনের সুন্দর বিষয়গুলিও শিখতে পারি। আসুন! আজ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় কণ্ঠের মুজিযা সম্পর্কে শুনি। হযরত বারাআ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; একবার নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের খুতবা দিলেন, ঘরে থাকা মহিলাদের নিকটও তাঁর আওয়াজ পৌঁছে গেলো, তিনি ইরশাদ করছিলেন: হে লোকেরা! যারা জিহ্বা দিয়ে ঈমান এনেছো, কিন্তু অন্তরে ঈমানের আন্তরিকতা (পরিপূর্ণতা) নেই, মুসলমানদের গীবত করো না, তাদের গোপন ত্রুটির পেছনে পড়ে থেকো না, যে তার ভাইয়ের গোপন দোষত্রুটির অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ পাক তার গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দিবেন এবং যার গোপন অবস্থা আল্লাহ প্রকাশ করবেন, তাকে ঘরের ভেতরেও লাঞ্ছিত করবেন। (দেখুন: দালাইলুন নবুওয়াত লিআবি নুয়াঈম, ২/২৬২) প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা! এটা ছিলো আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা যে, তিনি যখন চাইতেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বরকে এত দূরত্বে পৌঁছে দিতেন, যেখানে মানুষের কণ্ঠস্বর কোনো উপায় বা প্রযুক্তি ছাড়া পৌঁছাতে পারতো না, যেমনটি একবার জুমার দিন মিম্বরের উপর তিনি ইরশাদ করলেন: হে লোকেরা! বসো, তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাঁর কণ্ঠস্বর নিজ এলাকা বনী গনিমে শুনেছিলেন এবং আদেশের আনুগত্য করতে গিয়ে বসে গেলেন।

(দেখুন: দালাইলুন নবুওয়াত লিআবি নুয়াঈম, ২/২৬৩)

এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় শিখতে পারি:

* আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে মহান ক্ষমতা দান করেছেন
* নিজের মুসলিম ভাইয়ের গীবত করা এবং তার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা ভালো কাজ নয়, গীবত করাও হারাম এবং মুসলমানের সম্মানহানি করাও হারাম।
* সৎ উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতার সাথে মুসলমানদের দ্বীনি প্রশিক্ষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।
* সংশোধনের একটি পদ্ধতি এটাও যে, যার সংশোধন করতে হবে তাকে সবার সামনে সম্বোধন করার পরিবর্তে সম্মিলিতভাবে এভাবে সংশোধন করুন যাতে অন্যদের নিকট তার সত্তা প্রকাশ না পায়।
* কোন কাজ করার মানসিকতা তৈরি করার জন্য এর উপকারিতা এবং কোন কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য এর ক্ষতিকর দিকসমূহ সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বর্ণনা করা অধিক উপকারী।

মদীনায়ে মুনাওয়ারার ইতিহাস (পর্বঃ ০১)

মাওলানা মুহাম্মদ আসিফ ইকবাল আত্তারী মাদানী

কোন শহরের গুণাবলী তাকে অন্যান্য শহর থেকে আলাদা এবং অনন্য করে তোলে, মদীনা শরীফকেও আল্লাহ পাক অসংখ্য এমন গুণাবলী দান করেছেন যার বদৌলতে এই ভালোবাসার শহরটি সারা দুনিয়ার সমস্ত শহর এবং সমস্ত জনবসতি থেকে আলাদা মহিমা ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। এখানে কতিপয় গুণাবলী আলোচনা করা হচ্ছে:

(১) মদীনা মুনাওয়ারার ভূমি এই সৌভাগ্য লাভ করেছে যে, সকল সৃষ্টির সেরা সত্তা, হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা, আহমদে মুজতবা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর, সায়্যিদুনা ফারুকে আযম এবং অনেক সাহাবী ও মর্যাদাবান তাবেঈনদের সৃষ্টি এই নগরীর পবিত্র মাটি থেকে হয়েছে। এই নগরী সৃষ্টির সেরা হাবীবে খোদা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমাধিস্থল হওয়ার গৌরব ও সৌভাগ্য লাভ করেছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি কবরের কাছে রাখা একটি জানাযার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার কবর? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন:

ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অমুক হাবশীর কবর রাসূল করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ سِيقَ مِنْ أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ إِلَى تُرْبَتِهِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এই ব্যক্তিকে তার জমিন ও আসমান থেকে সেই মাটির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যা থেকে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (মুস্তদরাক ১৪/৬৯৬, হাদীস: ১৩৯৬) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন:

يُدْفَنُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে সেই মাটিতেই দাফন করা হয়েছে, যা থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(যুস'য়াফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩/৫১৫, হাদীস: ৬৫৩১)

(২) মদীনা শরীফ হলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিজরত করার স্থান এবং পৃথিবীতে তাঁর বাসস্থান। পবিত্র হাদীসে আছে:

اَلْمَدِيْنَةُ مُهَاجِرِي وَمَضْجَعِي فِي الْأَرْضِ

অনুবাদ: মদীনা আমার হিজরতের স্থান এবং পৃথিবীতে আমার বাসস্থান।

(মুজামে কবীর, ২০/২০৫, হাদীস: ৪৭৩)

(৩) মদীনা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে প্রিয় স্থান। তাঁর মহান বাণী হলো:

لَا يُقْبَضُ النَّبِيُّ إِلَّا فِي أَحَبِّ الْأَمْكِنَةِ إِلَيْهِ

অনুবাদ: নবীর ওফাত স্থান তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্থানেই হয়। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ১/৩৯, হাদীস: ৪১)

(৪) হাশরের দিন মদীনার মুনাওয়ারার জমি সর্বপ্রথম বিদীর্ণ করা হবে, হাদীস শরীফ অনুসারে সর্বপ্রথম পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সর্দার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জমিন থেকে বেরিয়ে আসবেন, তারপর সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, তাঁর পরে সায়্যিদুনা উমর ফারুক তারপর মক্কা শরীফের লোকেরা। (তিরমিযী, ৫/৩৮৮, আয়াত:৩৭১২)

মদীনা ত্বায়্যিবা কখন থেকে জনবহুল হয়ে উঠে:

আল্লামা সামহোদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর গবেষণা অনুসারে হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর তুফানের পর সর্বপ্রথম এই লোকালয়টি জনবহুল হয়ে উঠে। (মদীনাতুল রাসূল, পৃষ্ঠা: ৫২) এই ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম আবাদ হওয়া জাতি ছিলো আমালিকা বা আমালিক। এই লোকেরা ছিলো আমলাক বিন আরফাখশাদ বিন সাম বিন নূহের বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। তিনিই আল্লাহ পাকের ইলহামে আরবী ভাষা আবিষ্কার করেন। সর্বপ্রথম সেই জমিতে ক্ষেত খামার করেন এবং খেজুরের গাছ রোপন করেন। (ওয়াফাযুল-ওয়াফা, ১/১৫৬, ১৫৭। মদীনাতুর রাসূল, পৃষ্ঠা: ৫২। জযবুল-কুলুব, পৃষ্ঠা: ৬৩) তার পরে বনী ইসরাঈলের একটি দল এখানে আবাদ হয়। (ওয়াফাযুল ওয়াফা, ১/১৫৭। মাহবুবে মদীনা, পৃষ্ঠা: ৫৫৩) তারা হযরত হারুন عَلَيْهِ السَّلَام এর বংশধর এবং কতিপয় অন্যান্য ইহুদীরা তার পার্শ্ববর্তী খায়বর ইত্যাদিতে বসবাস করতে লাগলো। অধিকাংশ ইহুদী গোত্রের বসবাস মদীনা শরীফের আশেপাশে ছিলো। তারা মসজিদে কুবার উপরিভাগে এবং এর আশেপাশে বসবাস করতো। (খুলাসাতুল ফতোয়া, ১/৫২৩। জযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ৬৬, ৬৭) তারপর আমর বিন আমির নামে এক ব্যক্তি তার সন্তানদের নিয়ে সাবা (ইয়েমেন দেশ) ত্যাগ করেন, তার ১৩ জন পুত্র বিভিন্ন শহরে বসতি

স্থাপন করেন, যার মধ্যে সালাবা বিন আমের হিজাজের ভূমি পছন্দ করেন, এই ব্যক্তি আনসারী গোত্রের আউস ও খাযরাজের উত্তম উত্তরাধিকারী ছিলো, তাদের সন্তান সংখ্যা অধিক হয়ে গেলে তারা মদীনায় ফিরে আসেন এবং এখানে বসতি স্থাপন করেন। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১/১৭২। জযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ৬৯, ৭০) ইহুদি বনু কুরাইযা এবং বনু নুদ্বীর গোত্র তাদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন করেছিলো, পরে তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে আউস ও খাযরাযের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, যা ১২০ বছর যাবত স্থায়ী ছিলো। আল্লাহ পাক হুযুর নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং ইসলামের বরকতে সেই যুদ্ধের অবসান ঘটান। যার বয়ান সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে রয়েছে। (কুলাসাতুল ওয়াফা, ১/৫৭৬, ৫৮০। জযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ৭১)

মদীনা ত্বায়্যিবার নাম:

যদি কোনো ব্যক্তি, স্থান বা জিনিসের অসংখ্য নাম থাকে, তাহলে এটা তার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং উচ্চতা ও মাহাত্ম্যের পক্ষে প্রমাণ বহন করে, যেমনটি আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ পাকের সুন্দর নাম, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপূর্ব নাম এবং পবিত্র কুরআনের বরকতময় নাম অনেক বেশি। তদরূপ মদীনায়ে মুনাওয়ারারও অসংখ্য সুন্দর সুন্দর নাম ও অপূর্ব উপাধি রয়েছে, এই মর্যাদাবান শহরের প্রায় ১০০টি নাম ও উপাধি গণনা করা হয়েছে, পৃথিবীতে এমন কোনো শহর নেই যার এতো অধিক নাম রয়েছে। কতিপয় নাম এখানে বর্ণনা করা হলো:

(১) তাবা (২) তাইবা (৩) তায়্যিবা (৪) তা'য়িবা: এই নামগুলো হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিলো, এর অর্থ পাক, পবিত্র ও সুগন্ধিময়। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُسَمِّيَ الْمَدِينَةَ طَيْبَةً

অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেনো মদীনার নাম তায়্যিবা রাখি (মু'জামু কবীর, ২/২৩৬, হাদীস: ১৯৮৭) এবং একটি হাদীসে রয়েছে:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আল্লাহ মদীনার নাম রেখেছেন তাবা। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৫৫০, হাদীস: ৩৩৫৭)। তাওরাত শরীফেও মদীনার এই নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। (জযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ৬) (৫) আল্লাহর ভূমি (৬) হিজরতের ভূমি: এই নামের আলোচনা সূরা নিসার ৯৭ নং আয়াতে রয়েছে। (৭) ঈমান: সূরা হাশরের ৯ নম্বর আয়াতে একে ঈমান বলা হয়েছে, এবং এই পবিত্র নগরী ঈমানের বিধি-বিধান প্রকাশকারী এবং ঈমানের উৎস। (জযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ৮) (৮) রাসূলুল্লাহর ঘর: এই নামটি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সম্পর্কের কারণে। (৯) হাবীবা ও মাহবুবা: এটাও প্রিয় নাম। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করেছেন:

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক আমাদের কাছে মদীনা এমন প্রিয় বানিয়ে দাও যেমনটি আমাদের নিকট মক্কা প্রিয় অথবা তার চেয়েও বেশি। (বুখারী,

১/৬২১, হাদীস: ১৮৯০) (১০) হারামে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: হাদীস শরীফে এই নামটির আলোচনা এসেছে। ইরশাদ করেন:

المدينة حرم

অনুবাদ: মদীনা হারাম। (অর্থাৎ সম্মানিত ও মর্যাদাবান শহর)। (বুখারী, ১/৬১৬, হাদীস: ১৮৭০) (৯) অপরূপ: কারণ এই শহরের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, অভ্যন্তরীণ হলো, এখানে প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আহলে বাইত এবং সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতি রয়েছে আর বাহ্যিক হলো, এখানে বাগান, ঝর্ণা, কূপ, উঁচু পাহাড়, খোলা জায়গা এবং প্রাসাদের গম্বুজ এবং অনেক মাযার রয়েছে। (জযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ৯) (১২) মঙ্গল এবং কল্যাণ: এই শহর হলো দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের সমষ্টি এবং হাদীস শরীফে বলা হয়েছে:

اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ মদীনা তাদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ যদি তারা জানতো। (বুখারী, ১/৬১৮, হাদীস: ১৮৭৫) এগুলো ছাড়াও মদীনা শরীফের অনেক নাম রয়েছে, যেমন: ইকালাতুল কুরা, আল বারা, আল বাহরা, আল বালাত, আল জাবিরা, দারুল আবরার, দারুস সুন্নাহ, দারুস সালাম, যাতুল হিজর, যাতুল নাখাল, সায়্যিদুল বুলদান আশ শাফিয়্যাহ, তায়িব, আল মুতায়্যিবা, যিবাব আল আসিমা, আল উযরা, আল ঘুররা, গালবা, আল ফাযিহা, আল কাসিমা, কুব্বাতুল ইসলাম, ক্বারিয়াতুল আনসার, কালবুল ঈমান, আল মু'মিনা, আল মুবারাকাহ, মুবিনুল হালাল ওয়াল হারাম আল মুহারমাহ, আল মাহফুজা, আল মদীনা, আল মুখতারাহ, আল মারযুকা, আল মাকদিসা, আন নাজিয়া ইত্যাদি। এই প্রতিটি নামের কিছু মনোরম এবং সুন্দর অর্থ ও উদ্দেশ্য রয়েছে, বিস্তারিত জানার জন্য শায়খ মুহাক্কিক ইমামুল মুহাদ্দিসিন আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব "জযবুল কুলুব" এবং আহলে সুন্নাতের মহান লেখক ফয়েযে মিল্লাত, মুফতি ফয়েয আহমদ ওয়াইসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনুদিত কিতাব "মাহবুবে মদীনা" অধ্যয়ন করুন।

(অবশিষ্ট আগামী সংখ্যায়)

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই দুনিয়ার যাহেরী হায়াত থেকে পর্দা করেন তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ উপস্থিত হলেন এবং اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ পাঠ করলেন অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ করে প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযীলত বর্ণনা করতে লাগলেন, তখন পরিবারের সদস্যদের কান্নার আওয়াজ এতো উঁচু ছিলো যে, যা মসজিদের মুসল্লীরাও শুনেছিলো, যখন নূর নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযীলত ও গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছিলো তখন কান্নার আওয়াজও বৃদ্ধি পেতে থাকে, যাইহোক কান্নার আওয়াজ তখনি কম হলো যখন একজন সাহসী ব্যক্তি দরজায় এসে উচ্চ আওয়াজে বললো: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ হে পরিবারের সদস্যরা! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِ﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** প্রত্যেক প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (২১ পারা, সূরা আনকাবূত, আয়াত ৫৭) তাঁর দরবারে প্রত্যেক

nhiZ mvwq¨`bv Bjqvm عَلَيْهِ السَّلَام

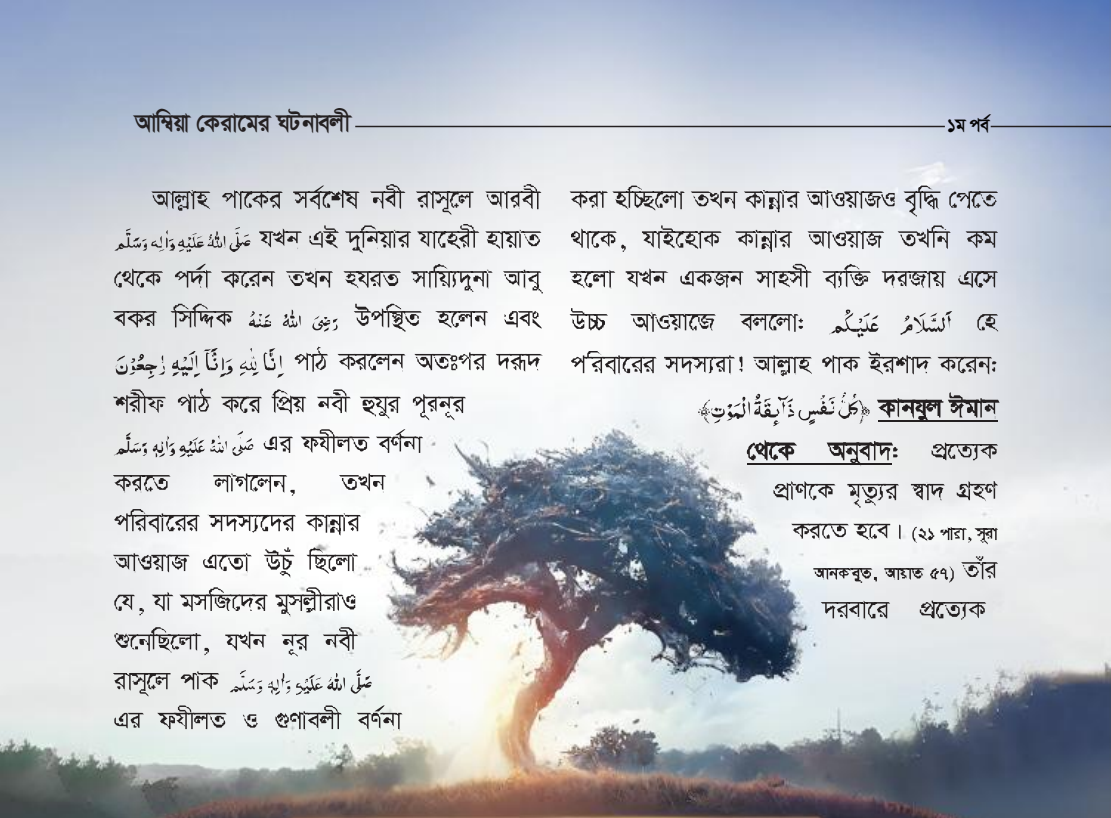

মাওলানা আবু উবাইদ আত্তারী মাদানী

পছন্দনীয় বস্তুর প্রতিদান রয়েছে, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান দেয়া হবে আর প্রত্যেক প্রকারের ভয় থেকে মুক্তি দেয়া হবে, সুতরাং আল্লাহ পাকের উপর আশা রাখুন এবং তাঁর উপর ভরসা করুন, পরিবারের সদস্যরা তাঁর আওয়াজ মনোযোগ সহকারে শুনলেন কিন্তু জানতে পারেনি যে, আওয়াজটা কার! সুতরাং সবাই নীরব হয়ে গেলো, যখন সবাই চুপ হয়ে গেলো তখন আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেলো, কেউ একজন বাইরে এসে দেখলো তখন কাউকে দেখতে পেলো না, পরিবারের সদস্যরা আবার কান্না করা শুরু করলো, তখন আরেকজন অনারবী আওয়াজ দিলো: হে পরিবারের সদস্যরা! সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের যিকির করো এবং তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করো যাতে তোমরা মুখলিস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো।

নিঃসন্দেহে! বিপদের সময় আল্লাহ পাককে স্মরন করার দ্বারা ধৈর্য ধারণ নসীব হয় এবং পছন্দনীয় জিনিস নিয়ে যাওয়ায় আল্লাহ পাককে স্মরন করাতে এর প্রতিদান দান করেন, সুতরাং

তাঁর আনুগত্য করো এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ বলেন: এই আওয়াজ দুটি হযরত সায়্যিদুনা খিজির ও হযরত সায়্যিদুনা ইলিয়াস عَلَیْہِ السَّلَام এর, যারা প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। (ইত্তিহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন,১৪/১৫৩) আর রাক্কা ওয়াল বাকায়ি লিইবনে কুদামা মাকদেসি, ১৪০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! হযরত সায়্যিদুনা ইলিয়াস عَلَیْہِ السَّلَام এর পবিত্র জীবনীর কিছু কিছু জ্ঞানগর্ব ও বরকতময় দিক অধ্যয়ন করি আর নিজের জন্য মুক্তির পাথেয় সংগ্রহ করি।

সংক্ষিপ্ত জীবনী: হযরত সায়্যিদুনা ইলিয়াস عَلَیْہِ السَّلَام আল্লাহ পাকের একজন অনেক প্রিয় নবীর নাম, ইলিয়াস ইবরানী ভাষার শব্দ, (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৭/৪০২) যার অর্থ হলো: আল্লাহ পাক ব্যতীত আর করো ব্যাপারে ভীতিহীন হওয়া (মাসিক ফয়যানে মদীনা জুমাদিউল আখির ১৪৪০ হি:) অতঃপর ইলিয়াস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো" ময়দান থেকে পালায়ন করে না এমন ব্যক্তি"। (নাম রাখনে কে আহকাম, ১৩১) কুরআনে তাঁর নাম ইলিয়াস ও ইল ইয়াসিন উভয়টি উল্লেখ রয়েছে। তাঁর পিতার নাম সব্বাসবা আর মাতার নাম সাফুরিয়া, তাঁর দাদী হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর কন্যা আর দাদা হারূন عَلَیْہِ السَّلَام এর পুত্র ছিলেন, এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বংশধারা কিছুটা এরকম, ইলিয়াস বিন সব্বাসবা বিন ইজার বিন হারূন।

(নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব' ১৪/১০)

গঠন ও গুণাবলী: তাঁর عَلَیْہِ السَّلَام গঠন ছিলো লম্বা, মাথা মোবারক ছিলো বড়, পেট মোবারক ভেতরের দিকে ঝুঁকানো অর্থাৎ শরীর ছিলো চর্বি বিহীন ও পা ছিলো পাতলা আর ত্বক ছিলো রুক্ষ ও শুষ্ক এবং তাঁর মাথায় লাল রঙের তিল। (মুস্তাদরাক ৩/৪৭০, হাদীস:৪১৭৫) তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁকে ৭০ জন আম্বিয়ায়ে কেরামের শক্তি দান করেছেন, গৌরব ও মহিমায় এবং শক্তি ও সামর্থ্যে হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর সমান ছিলেন। (সীরাতুল আম্বিয়া, ৭২২) বরং তাঁর চেহারা মোবারকও হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর সাথে সাদৃশ্য রাখতো। (নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/১১) আগুন, পাহাড় ও জঙ্গলের বাঘও তাঁর আনুগত্য করতো।

(নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/১১)

রিসালাত: বনী ইসরাঈলরা সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন করেছিলো, তিনি বালাবাক শহরে বনী ইসরাঈলদের নিকট রাসূল হিসাবে আগমন করেন এবং তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত ও উপদেশ প্রদান করেন, আল্লাহ পাক নিষ্টুর বাদশার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে তাঁকে মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য করে রেখে দিলেন।

(সীরাতুল আম্বিয়া, ৭২২ পৃষ্ঠা, সিরাতুল জীনান, ৮/৩৪১)

চারজন নবী এখনো জীবিত: মনে রাখবেন! চারজন আম্বিয়া عَلَیْہِمُ السَّلَام তাঁরাই যাদের উপর এক মুহূর্তের জন্যও মৃত্যু আসেনি, দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইদ্রিস ও হযরত ঈসা এবং দুই জন জমিনে হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৫০৫) এটাও মনে রাখবেন! নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শেষ নবী হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, তাঁর জামানায় (যুগে) এবং তাঁর যুগের পরেও কোন নবীর আগমন ঘটবে না, যদি পূর্বের কোন

নবী জীবিত থাকে তাতে কোন ক্ষতি নেই, তাঁর জীবিত থাকাটা প্রিয় নবীর শেষ নবী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা নয়। (মিরাতুল মানাযিহ, ৮/৮)

প্রিয় নবীর দরবারে হাযেরী: হযরত ইলিয়াস عَلَيْهِ السَّلَام নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৈন্যদেরকে একটি গুহায় এই দোয়া দ্বারা ধন্য করেছেন: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ اُمَّةِ اَحْمَدَ الْمَرْحُوْمَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে আহমদের উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাও, যার উপর তোমার রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয় এবং যার দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৯/২১৩, ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৩/৬৩৯) এমনকি প্রিয় নবীর দরবারে সালাম আরয করতে গিয়ে বলেন: আপনার ভাই ইলিয়াস আপনাকে সালাম আরয করছে, প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুহায় তাশরীফ আনলেন এবং হযরত ইলিয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে কুলাকুলি করলেন অতঃপর উভয় হযরত সেখানে বসে পরস্পর কিছু আলাপ চারিতায় লিপ্ত ছিলেন। (ফয়যুল কাদীর, ৩/৬৭২, হাদীস:৪১৩৩) হুদাবিয়ার সন্ধির সময় যারা বায়আতে রিদুয়ানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস عَلَيْهِمَا السَّلَام ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(মিরাতুল মানাযিহ, ৮/২৭৪)

হযরত ইলিয়াস ও হযরত খিযির عَلَيْهِمَا السَّلَام এর সাক্ষাৎ: হযরত ইলিয়াস ও হযরত খিযির عَلَيْهِمَا السَّلَام উভয় নবী পবিত্র রমযান মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে থাকতেন, রোযা রাখতেন, উভয়ে প্রতি বছর হজ্জে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, হজ্জের পর যমযমের পানি পান করতেন, যা তাঁদের জন্য সারা বছরের খাদ্য ও পানীয়ের জন্য যথেষ্ট। (আল জামে লিআহকামিল কুরআন লিল কুরতুবী, ৮/৮৬, আস সাফফাত, ১২৩, ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৬/৪০১) এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে মিনায় সাক্ষাৎ করেন, একে অপরের মাথা মুন্ডান এবং এই বাক্য পাঠ করে পরস্পর বৈঠক শেষ করেন: سُبْحٰنَ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَسُوْقُ الْخَيْرَ اِلَّا اللّٰهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يُصْلِحُ السُّوْءَ اِلَّا اللّٰهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ পুত: পবিত্র, যা আল্লাহ পাক চান, আল্লাহ ছাড়া কেউ কল্যান করতে পারে না, আল্লাহ পাক যা চান, আল্লাহ ছাড়া কেউ মন্দকে সংশোধন করতে পারে না, আল্লাহ পাক যা চান, নেকী করার সামর্থ্য আল্লাহ পাকই দান করেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৯/২১১) হযরত আব্দুল্লাহ ইববে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বলেন: যে ব্যক্তি ঐ দোয়া সকাল সন্ধ্যা তিন বার পাঠ করবে আল্লাহ পাক তাকে ডুবে যাওয়া, জ্বলে যাওয়া, তার সম্পদ চুরি হওয়া থেকে নিরাপদ রাখবে। শয়তান জালিম শাসক, সাপ ও বিচ্ছুর আক্রমন থেকে হিফাযত করবে।

(সীরাতে হালভিয়া, ৩/২১২)

পবিত্র ওফাত: বছরের বাকি দিন গুলোতে হযরত ইলিয়াস عَلَيْهِ السَّلَام জঙ্গলে ও ময়দানে পাহারা দিতে থাকেন এবং পাহাড়ে ও মরুভূমিতে একাকী আপন রবের ইবাদত করতে থাকেন আর হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام নদী ও সাগরে ভ্রমন করেন এবং আপন রবের ইবাদতে মশগুল আছেন। এই উভয় হযরত দ্বীনে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পালনের অনুসারী এবং শেষ যুগে ওফাত লাভ করবেন। (আযাযিবুল কুরআন, ২৯৪, মুস্তদরাক ৩/৪৭০, হাদীস: ৪১৭৫, ফয়যুল কাদীর ৪/৫৭২, হাদীস: ৫৮৮০)

হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র Akæ

আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

একদা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুআ'বিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে বললেন: আপনি হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে কী বলেন? তখন তিনি হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র প্রশংসা এভাবে বর্ণনা করলেন: আবু আমর (হযরত ওসমান গণির) প্রতি আল্লাহ পাক রহম করুন, তিনি ছিলেন সৃষ্টির মধ্যে উত্তম এবং তেলাওয়াত-কারীদের মধ্যে সর্বাধিক সাহসী, সেহরীর সময় উঠে ইবাদতকারী এবং আল্লাহর যিকির করে সর্বাধিক অশ্রু বিসর্জনকারী, যে ব্যক্তি হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে খারাপ বলবে, আল্লাহ জাব্বার কিয়ামত পর্যন্ত সেই ব্যক্তির পিছনে অনুশোচনা লেলিয়ে দিবেন (অর্থাৎ মুসলমান কিয়ামত পর্যন্ত এমন ব্যক্তিকে খারাপ বলতে থাকবে)। (মু'জামে-কবীর, ১০/২৩৮, হাদীস: ১০৫৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা যুন-নূরাইন ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র অগণিত মহৎ গুণাবলীর মধ্যে একটি মহৎ গুণ হলো, আল্লাহকে স্মরণ করে অজস্র কান্নাকাটি করা, কিন্তু এই মহৎ গুণটি কেবল আল্লাহর স্মরণের সময়েই সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য মুহূর্তেও তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতো। এ প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা লক্ষ্য করুন:

অশ্রুসিক্ত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন:

একদা হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ স্বীয় পুত্র হযরত আমর বিন ওসমানকে নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে আগত বিপদ-আপদের ঘটনা বর্ণনা করলেন: একবার রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছিলেন, রহমতে আলম তাঁর হাতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র হাত আঁকড়ে ধরেছিলেন, হাজরে আসওয়াদের কাছে তিনজন কাফের আবু জাহেল, উকবা ইবনে আবি মুঈত ও উমাইয়া বিন খলফ বসা ছিল, যখন রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হাজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন সেই তিনজন রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র শানে কিছু অপ্রীতিকর কথা

বললো (যার কারণে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কষ্ট পেলেন)

এই কষ্টের প্রভাব প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বরকতময় মুখমণ্ডলে পরিলক্ষিত হচ্ছিল, এটা দেখে আমি রহমতে আলমের নিকটবর্তী হলাম তখন হুযুর নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিকের মাঝে ছিলেন, হুযুরে আকদাস তাঁর আঙ্গুলকে আমার আঙ্গুলে প্রবেশ করালেন অতঃপর আমরা তিনজন সংঘবদ্ধ হয়ে তাওয়াফ করছিলাম, দ্বিতীয় চক্কর দেওয়ার সময় সেই কাফেরদের কাছে পৌঁছলে তারা বললো: আমরা তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ধি করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত সমুদ্রে এক টুকরো পশম ভিজানোর মতো পানি থাকবে। আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত করতেন তুমি আমাদেরকে তাদের ইবাদত থেকে বাধা দিচ্ছো, অতঃপর তৃতীয় চক্কর লাগানোর পর তারা পূর্বের ন্যায় কথা বললো, চতুর্থ চক্করের সময় তিনজন কাফের অতি দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে গেল, আবু জাহেল খামচি মেরে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় কলার ধরতে চাইলে আমি তার বুকে (হাত দিয়ে) ধাক্কা দিলাম ফলে সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উমাইয়া বিন খলফকে ধাক্কা দিলেন, নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উকবা ইবনে আবি মুঈতকে রুখে দিলেন ফলে এই তিনজন কাফের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আল্লাহর কসম, এই তিনজন কাফেরদের মধ্যে প্রত্যেকের উপর ভয় বিরাজ করছিল এবং তারা কম্পন করছিল, নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে দাঁড়িয়েই এই বাক্যটি ইরশাদ করলেন: আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি এই কাফেরদের না থামাতে, তাহলে অচিরেই আল্লাহর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করতো। এ ঘটনা বর্ণনা করার সময় হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো।

(আল ওয়াফা লিইবনিল জাওযী, ১/১৫১)

আহলে বাইতের অবস্থা দেখে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো:

একদা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পরিবারবর্গ চার দিন যাবত অনাহারে ছিলেন এমনকি শিশু ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদতে লাগলো, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অযু করলেন এবং মসজিদে চলে গেলেন, কখনো এক জায়গায় নামায আদায় করতেন আবার কখনো অন্য জায়গায় নামায আদায় করতেন, (কিন্তু এ বিষয়ে কোন সাহাবীকে অবগত করেননি), দিনের শেষভাগে হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উপস্থিত হয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাঁকে অনুমতি দিলেন, তিনি ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করলেন: হে মু'মিনদের মা, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথায়? হযরত আয়েশা সিদ্দিকা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন, যা শুনে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো অতঃপর তিনি বললেন, "দুনিয়া ধ্বংস হোক, আপনি কেন আমাকে, আব্দুল-রহমান বিন আউফ, সাবিত বিন কায়েস এবং অন্যান্য ধনী মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে জানালেন না?" অতঃপর তিনি বাইরে গিয়ে অনেক জিনিসপত্র আনলেন যাতে আটা, গম, খেজুর, একটি জবাইকৃত ও চামড়াবিহীন একটি ছাগল এবং ৩০০ দিরহাম ভর্তি একটি ব্যাগ ছিল। তারপর তিনি বললেন: এই জিনিস দিয়ে (খাবার

রান্না করতে এবং খেতে অনেক) সময় লাগবে, তাই তিনি রুটি এবং প্রচুর ভাজা মাংস নিয়ে এলেন এবং বললেন: আপনারা এটা খান এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্যও রেখে দিবেন। অতঃপর বিবি আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে শপথ করালেন যে: ভবিষ্যতে যখনই এরূপ ঘটবে তখন অবশ্যই আমাকে জানাবেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯/৫৩, ফাযায়িলে খুলাফায়ে রাশেদীন, পৃষ্ঠা: ৫১)

অশ্রুর বারিধারা বইতে লাগলো:

হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন কারো কবরে যেতেন, তখন এত অধিক কাঁদতেন যে, তার দাড়ি মুবারক চোখের জলে ভিজে যেত, কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো: জান্নাত এবং জাহান্নামের আলোচনার সময় আপনি এত কান্না করেন না যতটুকু কবরের আলোচনায় কান্না করেন? ইরশাদ করেন: নিশ্চয় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: কবর হলো আখেরাতের সর্বপ্রথম ঘাঁটি, যদি কবরস্থ ব্যক্তি এই ঘাঁটি থেকে মুক্তি পায় তবে পরবর্তী ঘাটিগুলো সহজ হয় আর যদি এই ঘাঁটি থেকে মুক্তি না পায় তবে পরবর্তী ঘাঁটিগুলো অধিকতর কঠিন হয়। (তিরমিযী, ৪/১৩৮, হাদীস: ২৩১৫)

জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলেন:

২হিজরী ১৯ রমযানে হযরত বিবি রুকাইয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ইন্তেকাল করেন, যাতে হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অঝোরে কাঁদতে থাকেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেস করলেন: কেন কাঁদছো? আরজ করলেন: আপনার জামাতা হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি, ইরশাদ করলেন: আমাকে জিব্রাইল আমীন বলেছেন যে, আমি যেন আমার দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলসুমকে তোমার সাথে বিয়ে দেই, শর্ত হলো, মোহরানা সেটাই হতে হবে যা রুকাইয়ার ছিল, সুতরাং উম্মে কুলসুমের বিয়ে তাঁর সাথে দিয়ে দেওয়া হলো। (মিরকাতুল-মাফাতীহ, ১০/৪৪৫, ৬০৮০ নং হাদীসের পাদটীকা) ৯ হিজরীতে হযরত উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ইন্তেকাল করেন, তখন হযরত ওসমান গণি কাঁদতে লাগলেন, প্রিয়নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: আমার তৃতীয় কন্যা থাকলে আমি তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিতাম।

(আনসাবুল আশরাফ লিল বালাযরী, ১/৪০১, সংখ্যা: ৮৬৪)

হযরত মিকদাদ এর মৃত্যুতে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল:

পুরাতন ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ কিন্দি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ৭২ বছর আয়ু পান, ৩৩ হিজরী সনে মদীনা থেকে ৩ মাইল দূরে জুরুফ নামক স্থানে তাঁর ইন্তেকাল হয়, তাঁর লাশ মুবারক লোকদের কাঁদে করে মদিনায় আনা হয়, তাঁর থেকে চিরবিদায় হওয়ায় হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র চোখ মুবারক থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৬০/১৫৩, ১৮২)

শুভাকাঙ্ক্ষীরা কান্নায় ভেঙে পড়লো:

হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ৩৫হিজরীতে ১৮ যুলহিজ্জায় রোজা অবস্থায় শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। তাঁর শাহাদাত বরণে মুসলিম উম্মাহ শোকে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং শুভাকাঙ্খীদের চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হয়।

হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا

ওয়াইস ইয়ামিন আত্তারী

সম্মানিত পাঠক! হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ও ছোটবেলায় সাহাবীয়ে রাসূল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত করেন। তিনি সাহাবীয়ে রাসূল হযরত মাখরামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পুত্র এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি ২য় হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬ বছর বয়সে মদীনায় আসেন আর মক্কা বিজয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন। (মু'জামু কবীর, ৬/২০। আল ইসতিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব, ৩/৪৫৫)

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর মুখে পানি ছিটিয়ে দিলেন: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর শৈশবের একটি স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: একবার নবীয়ে করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অযু করছিলেন এবং আমি পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঠিক তখন এক ইহুদী পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো (পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতময় গুণাবলী লিখা ছিলো এবং ইহুদীটি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মধ্যে এই গুণাবলী সন্ধান করছিলো অতএব) সে আমাকে বললো যে, তোমার নবীর পিঠ থেকে কাপড় সরাও, আমি সামনে অগ্রসর হয়ে কাপড়টি সরালাম, তখন তিনি আমার মুখে পানি ছিটিয়ে দিলেন।

(মুসনাদে আহমদ, ৬/৪৮৭, হাদীস: ১৮৯৩০)

হুযুর পাত্রে খেজুর দান করলেন:

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে খাবারের জন্য এক পাত্র খেজুর দান করলেন।

(মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৪/৬৭১, হাদীস: ৬২৮৪)

পিতার সাথে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিতি: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমার

পিতা হযরত মাখরামা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ আমাকে বললেন: বৎস! আমি সংবাদ পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট জুব্বা এসেছে, যা তিনি বণ্টন করছেন, তুমি আমাকে নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট নিয়ে চলো! সুতরাং আমরা প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর পবিত্র ঘরে ছিলেন। বাবা আমাকে বললেন: বৎস! আমার জন্য নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ডাকো। আমার কাছে এ ব্যাপারটি অপ্রীতিকর লাগলো এবং আমি বললাম: আমি কি আপনার জন্য নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ডাকবো? আমার পিতা বললেন: বৎস তিনি জাব্বার নন। অতঃপর আমি প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ডাকলাম, তিনি صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বেরিয়ে এলেন, তাঁর নিকট একটি রেশমের জুব্বা ছিলো যার বোতাম ছিলো স্বর্ণের। নবীয়ে করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে মাখরামা! এটি আমি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছি এবং সেই জুব্বা আমার বাবাকে দিয়ে দিলেন। (বুখারী, ৪/৬৭, হাদীস: ৫৮৬২)

হাদীস বর্ণনা: তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ২২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ২/৯৪)

ওফাত: প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৮ বছর। তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ৬২ বছর বয়সে ৬৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মক্কায় শাহাদাত বরণ করেন। (মু'জামু কবীর, ৬/২০)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আচরণ

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র খাদেমদের সাথে আচরণ (পর্ব: ০৭)

মাওলানা নাসির জামাল আত্তারী মাদানী

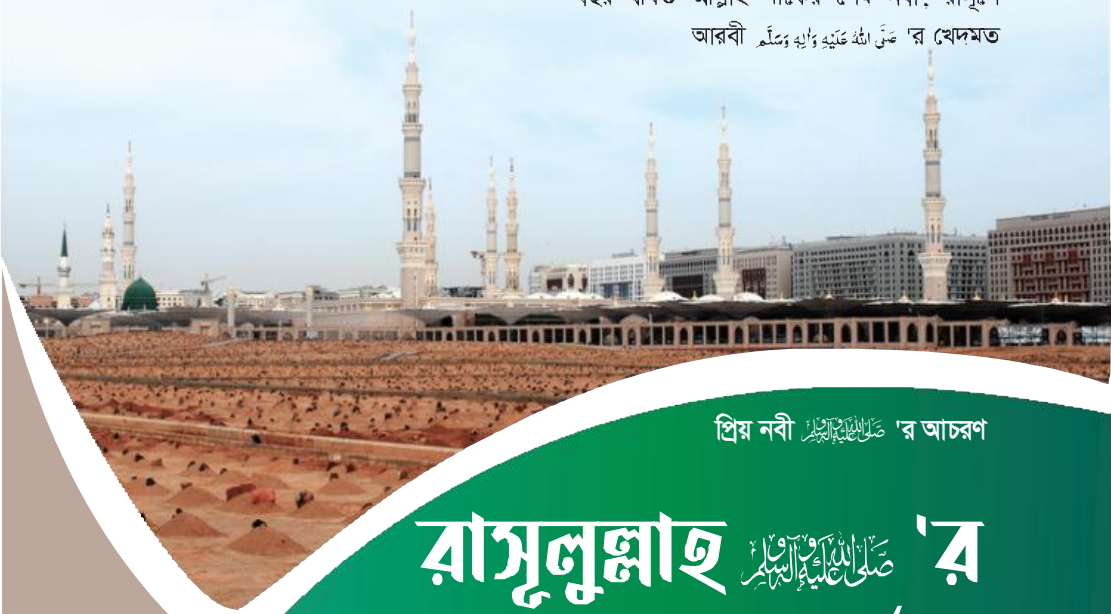

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র মহিমা কতইনা অনন্য, তাঁর যিয়ারত মু'মিনদের অন্তরের প্রশান্তি, তাঁর সাথে ভালোবাসা পোষণ করা পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন এবং তাঁর জীবনী অনুযায়ী জীবনযাপন করা সাফল্যের নিশ্চয়তা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র গোলামদের প্রতি করুণায় চিত্র এই পংক্তিতে কী চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

আতা হে ফকিরো পে উনহে পিয়ার কুছ এয়সা
খোদ ভিক দে অর খোদ কাহে মানগতা কা ভালা হো

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সেবকদের প্রতি করুণার ধরন ছিল খুবই অনন্য, আসুন! এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত পড়ি।

কয়েকজন মোস্তফার খাদেম:

(১) হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ দশ বছর যাবত আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র খেদমত

করেছেন। (২) হযরত আসলা' বিন শরীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র জিনের উপর জিনিসপত্র রাখতেন। (৩) হযরত আয়মান বিন উবায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পবিত্রতা অর্জনের পাত্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যখনই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم গমন করতেন তখন তিনি নববী দরবারে সেই পাত্র উপস্থাপন করতেন। (৪) হযরত বেলাল আযান দেওয়া ব্যতীত পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের দায়িত্বে ছিলেন। (৫) হযরত হাসান আসলামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র বাহনকে হাঁকাতেন। (৬) হাবশার বাদশাহ হযরত নাজাশী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর ভাতিজা বা ভাগ্নে হযরত যু মাখমার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে তাঁর স্থলে সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র সেবার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। (৭) হযরত রাবীয়াহ আসলামী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজ দায়িত্বে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র অযুর পাত্র উপস্থাপনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। (৮) যখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ওমরাহ পালন করার জন্য গমন করেন, তখন তাঁর উট চালানোর দায়িত্ব হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ গ্রহণ করেছিলেন। (৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র বরকতময় জুতা পরিধান করানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। (১০) হযরত উকবা বিন আমীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পবিত্র কোরআন এবং ইলমে ফরাইয সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন এবং মহান কবি ছিলেন, কিন্তু তিনি সৌভাগ্য মনে করে সফররত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র উট হাঁকানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। (১১) হযরত মুগীরা বিন শু'বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রহমতে আলম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র জন্য অস্ত্র বহনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/৪১৪)

উপরোল্লিখিত এই সকল কর্মকান্ডে সাধারণভাবে সমাজে উঁচু নিচু হওয়াই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এর ফলে প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পায়, কিন্তু উৎসর্গ হোন আল্লাহর শেষ নবী মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র প্রতি! তিনি তাঁর সেবকদের প্রতি অতুলনীয় দয়া ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতেন। এ প্রসঙ্গে দয়ালু আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র দয়ালু ধরন আপনিও অধ্যয়ন করুন:

(১) সেবকদের অবজ্ঞা করা একটি সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু আমার আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর আচার- আচরণের মাধ্যমে সেবকদের নিজের নিকটবর্তী করে পাহাড়ের চূড়া সমপরিমাণ সম্মানিত করেছেন, সুতরাং তাজেদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন সকাল বেলার নামায আদায় করতেন তখন মদীনার সেবক পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে আসতো, যে পাত্র তাঁর সামনে আনা হতো, তিনি তাতে তাঁর বরকতময় হাত ডুবিয়ে দিতেন। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৯৭৭, হাদীস: ২৩২৪) মদীনার কোনো দাসী বা ছোট মেয়ের কোনো কাজ বা কোনো ধরনের প্রয়োজন হলে তাঁরা রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেত। নিঃসন্দেহে এটি উঁচু পর্যায়ের বিনয় এবং অহংকারের সকল প্রকার থেকে মুক্ত হওয়ার প্রমাণ। (বুখারী, ৪/১১৮, হাদীস: ৬০৭২)

(২) সাধারণভাবে সেবকদের কথায় কথায় বাধা দেওয়া নিজের অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়, জিহ্বার তীরের মাধ্যমে হাতকে অস্ত্র বানিয়ে

আক্রমণ করা হয়, এবং এর উদ্দেশ্য বিভিন্ন সময় তাদেরকে অপমানিত করার হয়ে থাকে যা অপমান ও লজ্জার কারণ হয়। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ধরন ছিল এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত, সুতরাং হযরত আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোনো সেবককে প্রহার করেননি এবং কখনো কোন মহিলাকে প্রহার করেননি।

(অবু দাউদ, ৪/৩২৮, হাদীস: ৪৭৮৬)

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছোটবেলা থেকেই নববী দরবারে খেদমত করার সুযোগ পেয়েছিলেন, খেদমতকালীন তিনি যে নববী আচরণ দেখেছেন তা তিনি কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন: আমি সফর ও ঘরে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সেবা করেছি, আমার কৃত কর্মের ব্যাপারে তিনি কখনো এটা বলেননি যে, তুমি এটা কেন করেছো? আর কোন কাজ না করাতে এরূপও বলেননি যে, এই কাজটি এভাবে কেন করলে না?

(বুখারী, ৪/১১৮, হাদীস: ৬০৭২, উমদাতুল কারী, ১৫/২২৪)

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মুস্তফার আচরণ সম্পর্কে বলেন: আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, একবার তিনি আমাকে কোন কাজে পাঠালে আমি বললাম: আল্লাহর কসম! আমি যাব না। অথচ আমার মনে মনে ছিল যে, আল্লাহর নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে কাজের জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই কাজে অবশ্যই যাবো। আমি সেটি করতে বের হলাম এমনকি আমি সেই শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যারা বাজারে খেলাধুলা করছে অতঃপর হঠাৎ পেছন থেকে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার গর্দান ধরলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি মুচকি হাসছেন। তিনি বললেন: ছোট আনাস! তুমি কি সেখানে গিয়েছিলে যেখানে আমি যাওয়ার জন্য বলেছি? আমি বললাম : জী হ্যাঁ। আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি যাচ্ছি।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৯৭২, হাদীস: ৬০১৫)

(বাকিটা আগামী মাসের সংখ্যায়)

বুযুর্গদের স্মরণ

মাওলানা আবু মাজেদ মুহাম্মদ শাহেদ আত্তারী মাদানী

ইসলামী বছরের ১২তম মাস হলো যিলহজ্ব, এই মাসে যে সকল সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে ইযাম ও ওলামায়ে ইসলামের ওফাত বা ওরস রয়েছে তাঁদের মধ্য থেকে ৯৪ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাসিক ফয়যানে মদীনা যিলহজ্ব ১৪৩৮ - ১৪৪৪ হিজরী সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে, আরো ১১ জনের পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان

★ শহীদদের অবরোধের দিনঃ যিলক্বদ মাসের ৩৫ হিজরীতে মিশরের বিদ্রোহীরা আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ঘর অবরোধ করে নিলো, এই অবরোধ প্রায় ৪০ দিন যাবৎ অব্যাহত ছিলো, কিছু সাহাবায়ে কেরাম (যিয়াদ বিন নাঈম, আব্দুল্লাহ বিন যামআ, আব্দুল্লাহ বিন আবি মুররাহ, আব্দুল্লাহ আকবর বিন ওয়াহাব) শহীদ হয়, ১৭ বা ১৮ যিলহজ্ব আমীরুল মুমিনীনের নির্মম শাহাদাতের মাধ্যমে এই অবরোধের অবসান হয়। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪/৮৩, ১৯৫, ২২৫, ৩৭৯ - ২/৪৮৬, আল বেদায়াতু ওয়ান নেহায়া, ৫/২৫৪ - ২৮০)

(১) সৈয়্যদুল আনসার হযরত সাদ বিন মুয়াজ আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বনু আব্দুল আশহাল (আউস) এর সর্দার ছিলেন, অনন্য সৌন্দর্যের অধিকারী, সাহসী, মদীনা শরীফে প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, খন্দক যুদ্ধে (যিলক্বদে ৫ হিজরীতে) আহত হন এবং এক মাস জীবিত থেকে ৩৭ বছর বয়সে (যিলহজ্বের ৫ম হিজরীতে) শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর ইন্তেকালে আরশ কেঁপে উঠেছিলো, আসমানের দরজা খোলে দেয়া হলো এবং ৭০ হাজার ফেরেশতাও তাঁর জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করেন। (তাবকাতু ইবনু সাদ, ৩/৩২০ ও ৩৩২, মারেফাতুস সাহাবা লিআবি নাঈম, ২/৩৯২, আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩/৭০)

আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام

(২) তাজুল আরেফীন হযরত বাবা তাজ উদ্দীন সারওয়ার শাহীদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর জন্ম ৬৪৩ হিজরীতে পাক পাতনে হয়। তিনি চিশতিয়া শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেটাকে ন্যায় পরায়ণতা

ও হেদায়তের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক অমুসলিম মুসলমান হয়, একারণে অমুসলিমরা তাঁকে ৪ যিলহজ্ব শহীদ করে দেয়। তাঁর পবিত্র মাজার পুরনো চিশতিয়ায় ফয়েয ও বরকত বন্টন করে যাচ্ছে।

(তাজুল আরেফীন, পৃ: ৪১,৪৮,৫১,৭২,১০৩)

(৩) হযরত সৈয়দ শাহ শিহাব উদ্দীন নেহরা বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ৯৬৪ হিজরীতে হযরত সৈয়দ মোজ দরিয়া সোহরাওয়ার্দীর ঘরে হয়। তিনি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী, ওলীয়ে কামেল, কারামত সম্পন্ন ও সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ত্বরিকতের শায়খ ছিলেন। তাঁর ওফাত ১১ যিলহজ্ব ১০৪১ হিজরীতে হয়। তাঁর মাযার শরীফ খাজা কোট সাঈদ লাহোরের কাছে ইসলাম পুরা ভোগিওয়ালে অবস্থিত। (তাহকিকাতে চিশতি, ২২৭ - ২৩০)

(৪) ওমদাতুল কামেলিন হযরত খাজা নূরুল্লাহ তুগীরভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওলীয়ে কামেল, কারামাতের অধিকারী এবং আসতানায়ে আলিয়া তুগীরভী জেলা বাহাওয়াল নগরের তৃতীয় সাজ্জাদা নশীন ছিলেন। তিনি ১৫ যিলহজ্ব ১২৯৮ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। আসতানায়ে আলিয়ায় তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

(তাযকেরায়ে মাশায়েখ তুগীরাহ শরীফ, পৃ: ৩৫৬ -৩৫৯)

(৫) হযরত সৈয়দ মাহমুদ আগা কাবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুরীদ ও খলিফা হযরত সৈয়দ মীর জান কাবলী, আলিমে মুতবাহার, ওলীয়ে কামেল, কারামতের অধিকারী ও শায়ের (কবি) ছিলেন। তাঁর ওফাত ১১ যিলহজ্জ ১২৯৯ হিজরীতে হয়, হযরত ঈশা বেগম পুরা লাহোরে তাঁর মাযার মোবারক অবস্থিত।

(তযকেরায়ে খানওয়াদা হযরত ঈশা, পৃ:৩৩২ - ৩৩৭)

(৬) পীরে তরিকত হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ নকশবন্দী আমীর তাসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পীর সৈয়দ ইসমাঈল হাসান লুধিয়ানবীর মুরিদ ও ন্যায়পরায়ণ ও পথ প্রদর্শক ছিলেন। ৯ যিলহজ্ব ১৩৩৯ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, মাযার মোবারক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি জিটি রোড লাহোরের বুধুকা আওয়াহার বিপরীতে অবস্থিত।

(মদীনাতুল আউলিয়া, পৃ: ৪৪৮ -৪৪৯)

(৭) হযরত খাজা মুহাম্মদ ওমর দ্বীন আসগর চিশতি সাবেরী আমরতাসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সূফি মুহাম্মদ সিদ্দিক চিশতি কালি মান্ডি হাফিযাবাদ জেলার মুরিদ ও খলিফা ছিলেন, তিনি সাবেরি মসজিদ বধুমালহি জেলা নারওয়ালের প্রতিষ্ঠাতা ও তরিকতের শায়খ ছিলেন। তাঁর ওফাত ২৮ যিলহজ্ব ১৩৮৮ হিজরীতে হয়, তাঁর মাযার আরাইয়ান কবর স্থান, মেহের হানীফা রোড কোর্ট খাজা সাঈদ লাহোরে অবস্থিত।

(ইনসাইক্লোপিডিয়া আউলিয়ায়ে কেরাম, ৩/৫৮২ - ৫৮৫)

ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام

(৮) হযরত শায়খ আলাউদ্দীন ইবনে জাযুরী আবুল হাসান আলী কুরশী দামেস্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ৭৪৮ বা ৭৪৯ হিজরীতে হয় এবং ৮১৩ হিজরীতে যিলহজ্ব মাসে সিরিয়ার দামেস্কে ওফাত লাভ করেন। তিনি সিরিয়া ও হিজাজের মুহাদ্দিস ও ফকিহ গনদের থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত হন এবং

সারা জীবন শিক্ষকতায় অতিবাহিত করেন, তাঁর অসংখ্য ছাত্র রয়েছে।

(আদ দ্বোয়িল আমায়ি লিআহলিল কুরনিত তাসিয়ি, ৫/১৫৭, ৫৪৩ সংখ্যা)

(৯) মুজাহেদে আহলে সুন্নাত মাওলানা সৈয়দ ফয়জুল হাসান তানভীর শাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম সামশ আবাদ ১৩৪৫ হিজরীতে জেলা এট্যাকে হয়। ইলমে দ্বীনের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন নিজ এলাকা থেকে অর্জন করার পর দারুল উলুম হিজবুল আহনাফ লাহোরে ভর্তি হন এবং পড়াশোনা শেষ পর্যন্ত সেখানেই অধ্যয়ন চালিয়ে যান। দারুল উলুম মাযহার ইসলাম বেরলভী হতে দওরায়ে হাদিস করেন এবং পীর বশির উদ্দিন শাহ কাদেরী বেরেলী থেকে বায়আত ও খিলাফত লাভ করেন। তিনি সাহর বয়ানের খতিব, মাদরাসা আরাবিয়া ফয়যুল উলুম ফকির ওয়ালের প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টির আশ্রয়স্থলদের প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৭ যিলহজ্ব ১৪০৫ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, মাযার মোবারক ফকির ওয়াল জেলা বাহাওয়াল নগরে অবস্থিত।

(আত তনভীর,পৃঃ ৭,১৬,১৯,,২৪,২৭,৩২)

(১০) দরবেশ কামেল হযরত মাওলানা গোলাম রাসূল নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২ যিলহজ্ব ১৩৫৯ হিজরীতে ফতওয়ালা গ্রামে তাহসীল সড়কপুর জেলা শেখওয়া পুরায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং এখানেই ১০ যিলহজ্ব ১৪৩৭ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। তিনি ফাযিল দারুল উলুম হিজবুল আহনাফ লাহোরে সুফি বা সাফায় ব্যাপক অধ্যয়ন ও সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন। প্রায় সাড়ে সাতাইশ বছর হুযুর দাতা সাহেব জামে মসজিদে মুয়াজ্জিন ও নায়েবে ইমাম ছিলেন

(জেলা বাহাওয়ালা নগর কা তায়ারুফ ওয়া আসফার, পৃঃ ২৫)

(১১) বাবাজি হযরত মাওলানা হাফেয মেহেরজান আলী গোল্ডভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন আল্লামা গোলাম মেহের আলী চিশতিয়ানীর ভাই, হাফিয কুরআন, আলিমে দ্বীন, দরসে নেযামীর শিক্ষক, উস্তাযুল উলামা, স্কুলের আরবী টিচার, সুফিয়ে বা সাফা, মাদরাসায়ে কাদেরীয়া গাউছিয়া মঞ্চনাবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৩৭৮ হিজরীতে এবং ওফাত ১২ যিলহজ্ব ১৪৪০ হিজরীতে হয়। মাযার মোবারক বাওয়ালানগর জেলার মঞ্চনাবাদ রোডের কাছে কবুত্রী বানুওয়ালায় অবস্থিত।

(জেলা বাহাওয়ালা নগর কা তায়ারুফ ওয়া আসফার, পৃঃ ৪৭)

বার্ষিক ছুটিতে আমাদের শিশুরা কি করবে?

মাওলানা নাসির জামাল আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাকের সৃষ্টিকৃত বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, তাদের মধ্যে কিছু এমন যেগুলোকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য কোনো প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয় না, যেমন জমিন এবং তারকারাজি। কিছু কিছু এমন যাদের পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া প্রয়োজন, যেমন মানুষ, তাকে পরিপূর্ণতার স্তরে পৌঁছানোর জন্য প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। প্রশিক্ষণের এই প্রক্রিয়াটি শৈশবকাল থেকে শুরু হয় এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বার্ষিক ছুটি একটি সুবর্ণ সুযোগ, এই সুযোগটি কাজে লাগাতে অভিভাবকদের জন্য এখানে কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করা হচ্ছে:

শিশুদের জন্য পুরো দিনের টাইম টেবিল তৈরি করুন:

এই ছুটির দিনে শিশুদেরকে এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝিয়ে দিন যে, প্রত্যেকের কাছে ২৪ ঘন্টা থাকে যার সদ্ব্যবহার করে সফলতা অর্জন করা যেতে পারে এবং যার অপব্যবহার ব্যর্থতার গ্লানি বহন করায় এবং মাঝে মাঝে ব্যর্থতার দায়ভার অন্য কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। শিশুদের ২৪ ঘন্টার গুরুত্ব সম্পর্কে মানসিকতা তৈরি করার পর, তাদের আগ্রহের কথা মাথায় রেখে একটি সময়সূচী তৈরি করুন যা অনুসরণ করা সহজ হয় এবং যাতে কোন জটিলতা থাকে না।

শিশুদের ফোকাস করতে শেখান:

আমরা এ বিষয়টি খুব ভালো করেই জানি যে, প্রতিটি কাজ মনোযোগ চায়, আর কোন কাজকে অমনোযোগী সহকারে করা ব্যর্থতা ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় অতএব, আমরা এই ছুটির সময় শিশুদেরকে তাদের কাজে ফোকাস করা শেখাতে হবে, তাই শিশুদের বলুন যে, কোন কাজকে ফোকাস করে করার মাধ্যমে আমরা এই উপকারগুলো পেতে পারি:

(১) আমাদের মস্তিষ্ক এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানো থেকে বিরত থাকবে এবং নিয়মিত ফোকাসের অনুশীলনের কারণে

এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে আগত বিপদ-আপদ দূর হয়ে যাবে (২) আসন্ন সমস্যাগুলি সমাধান করা সহজ হবে (৩) কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে (৪) ত্রুটি বিচ্যুতি না হওয়ার বা কম থেকে কম করার সম্ভাবনা থাকবে (৫) দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি

শিশুদের জন্য রিডিং সার্কেল তৈরি করুন:

এই ছুটিতে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যেরও যত্ন নেওয়া উচিত এবং এটি করার সর্বোত্তম উপায় হলো শিশুদের বইয়ের সাথে সংযুক্ত করা এবং পড়ার ক্ষেত্রে অবিচলতা তৈরি করার জন্য বাড়িতেই রিডিং সার্কেল তৈরি করা। রিডিং সার্কেলের একটি রূপ হলো, দিনের বিভিন্ন অংশে বাড়ির একজন সদস্য কোন বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা পড়বে এবং সবাই শোনবে, উদাহরণস্বরূপ: ফজরের নামাযের পর এই মাসিক পুস্তিকার পূর্বের নিবন্ধে প্রকাশিত তাফসীরে কোরআনের কলামটি পড়ে শুনিয়ে দিন, এভাবে অল্প সময়ে প্রতিদিন তাফসীর সহ একটি আয়াত পাঠ করার, বোঝার এবং আমল করার সুযোগ পাওয়া যাবে এবং কুরআনের প্রতি আরও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, পরে সেই দিন দূরে নয় যেদিন আমাদের শিশুরা তাফসীর সিরাতুল-জিনান বা এক খণ্ড সম্বলিত ইফহামুল কোরআন বা সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত দুই খণ্ড সম্বলিত "তাফসীর তা'লীমুল কুরআন" নিজে নিজে পড়া শুরু করে দিবে। অতঃপর একটি হাদীস ও তার ব্যাখ্যা শোনার ব্যবস্থা করতে পারেন, এজন্য মাসিক ফয়যানে-মদীনায় প্রকাশিত হাদীস ও হাদীসের ব্যাখ্যা পাঠ করা খুবই উপকারী হবে। এই ছুটির দিনে এটা করার ফলে এমন দিনও আসবে যেদিন আমাদের সন্তান বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা নুযহাতুল-ক্বারী মিশকাতের বিখ্যাত উর্দু ব্যাখ্যা মিরআতুল মানাজীহ, হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ রিয়াযুস সালিহীনের উর্দু ব্যাখ্যা ফয়যানে রিয়াযুস সালিহিন এবং মাকবাতাতুল-মদীনা হতে অচিরেই প্রকাশিত শরহে তাজরীদে বুখারি বনাম যিয়াঈল-কারী পড়ার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। إن شاء الله প্রতিদিন একটি নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাতে লিখিত গ্রন্থ (ফয়যানে নামায, গীবতের ধ্বংসলীলা, নেকীর দাওয়াত ইত্যাদি গ্রন্থ গুলো) এবং পুস্তিকা থেকে দরসের ধারাবাহিকতাও রাখুন কারণ এইগুলি এমন একজন মহান লেখকের লেখা যা পড়ে এবং শোনে অসংখ্য মানুষ সঠিক পথের পথিক হয়েছে। দাওয়াতে-ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে পড়ার জন্য একটি পুস্তিকা দেওয়া হয়, সেই পুস্তিকাটিও রিডিং সার্কেলের জন্যও উপযোগী।

মনে রাখবেন যে, দাওয়াতে-ইসলামী কতৃক আসা লেখাগুলোতে Story Telling এর কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে যার কারণে প্রতিটি বয়সের মানুষ বইয়ের সাথে এক ধরণের "Emotional Attachment" অনুভব করে এবং এই জিনিসটি তাকে ভালো হতে এবং মন্দ ত্যাগ করতে সাহায্য করে। এটাও মনে রাখবেন যে, এই রিডিং সার্কেল থেকে ভাল ফলাফল পেতে পিতামাতার উপস্থিতি এবং গুরুত্ব উভয়টিই প্রয়োজন।

শিশুদের জন্য শারীরিক কার্যকলাপের ব্যবস্থা করুন:

বর্তমানের শিশুদেরকে ডিভাইস (যেমন, মোবাইল, আইপ্যাড, ট্যাবলেট ইত্যাদি) আঁকড়ে ধরে রেখেছে, যার কারণে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং শারীরিক স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তারা Active থাকার পরিবর্তে অলসতার স্বীকার হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে "Procrastination" বা গড়িমসির অভ্যাস পরিপক্ক হচ্ছে, তাই যখন আমরা কোন কাজ দিই বা একটি কাজ অর্পণ করি, তখন তারা উত্তেজিত কণ্ঠে " করে নিচ্ছি" বলে না, বরং গড়িমসির ভঙ্গিতে বলে "পরে করে নিবো"। আপনি যদি চান যে, আপনার শিশুরা যাতে এই ধরনের পরীক্ষায় না পড়ুক, তবে আপনার উচিত তাদের কিছু না কিছু শারীরিক ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত রাখা যাতে শিশুরা এখন থেকেই Now or Never" এখন না হলে কখনো না "'র অনুভূতিতে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ হয়। পরামর্শ হলো, দাওয়াতে-ইসলামীর দ্বীনি কাজে আপনিও অংশগ্রহণ করুন এবং শিশুদেরও সাথে রাখুন কারণ দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক দ্বীনি কাজ অত্যন্ত চমৎকার শারীরিক একটিভেটি।

"আমি জানি না এবং আমি শিখে নিবো" এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন:

এই ছুটিতে আমাদেরকে শিশুদের বলতে হবে যে, তাদের কী শেখা প্রয়োজন এবং শেখার উপকারিতা কী? না শেখার কারণে আমাদের কী ক্ষতি হয়।" শিশুদেরকে অতি আত্মবিশ্বাসমূলক এই শয়তানী বাক্যাংশ" আমি সব পারি" থেকে রক্ষা করার জন্য এটি করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তাদের মধ্যে শেখতে থাকার এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য লেগে থাকে এবং "আমি পারি না" এর অনুভূতি তাদের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করবে এবং আমি শিখে নিবো বা আমাকে এখনো অনেক কিছু শিখতে হবে এরূপ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা তাদের মনোবল ও উৎসাহকে আরো শক্তিশালী করবে।

সম্মানিত পিতা-মাতা, আমাদের সন্তানরা আল্লাহর আমানত, তাদের সুরক্ষা ও যত্ন আমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আমাদেরকে এই ছুটিতে এই দায়িত্বের প্রতি সচেতন থেকে ভালো অভ্যাস বৃদ্ধি এবং মন্দ অভ্যাসগুলো দূর করতে হবে।

খন্দকের যুদ্ধ (কারণ ও নিদর্শন)

বেলাল হুসাইন আত্তারী মাদানী

হুযুর নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনীর একটি বড় অংশ যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত। এই দিকটি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই নয় বরং মানব জীবনের অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক ক্ষেত্রেও নির্দেশনা প্রদান করে। মদীনায়হিজরতের পর শুরু হওয়া প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, যা ৫ম হিজরীর শাওয়াল/যিলক্বদ মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

(বুখারী, ৩/৫৪, হাদীস: ৪১১০। সিরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩৮৭। তাবক্বাতে ইবনে সাঈদ, ২/৫০)

খন্দক এবং আহযাব বলার কারণ: খন্দক অর্থ হলো যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য খননকৃত গভীর ও দীর্ঘ পরিখা, এটি প্রতিরক্ষার একটি পারস্য যুদ্ধ কৌশল। এই যুদ্ধে যেহেতু মদীনা তয়্যিবার প্রতিরক্ষার জন্য বিশাল এলাকা জুড়ে একটি দীর্ঘ পরিখা খনন করা হয়, তাই এই যুদ্ধকে খন্দক বলা হয় এবং আহযাব যুদ্ধও এই যুদ্ধেরই নাম, আহযাব অর্থ হলো অনেক দল, যেহেতু ইহুদীরা মক্কার মুশরিক এবং বিভিন্ন আরব গোত্রের সাথে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য একটি সামরিক জোট তৈরী করেছিল, তাই একে আহযাব যুদ্ধও বলা হয়। (মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, ১/২৩৮)

দৃশ্যপট: ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ এবং ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন বনুনদ্বীর গোত্রের ইহুদীদের অবরোধ করে তাদেরকে মদীনা তয়্যিবা থেকে নির্বাসিত করেন, তখন তাদের কয়েকজন সর্দার (হুয়া বিন আখতাব প্রমুখ) খয়বারের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে তাদের অত্যন্ত সম্মান করা হতো, এমনকি সেখানে

তাকে তারা নিজেদের সর্দার হিসাবে গ্রহণ করেছিলো। বনু নদ্বীর যুদ্ধে নির্বাসনটি ছিলো, তার কপালে অপমানের কুৎসিত দাগ, যা দূর করতে সে মদীনা তায়্যিবার উপর প্রবল আক্রমণের পরিকল্পনা শুরু করে। প্রথমে সে মক্কায় এসে কুরাইশের কাফেরদের সাথে সাক্ষাত করে, এই সাক্ষাতটি ছিলো খুবই আনন্দদায়ক, কুরাইশদের বুক ইতিমধ্যেই বদর প্রভৃতির প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিলো, তাই তারা যুদ্ধে যোগদান করতে সানন্দে সম্মতিপ্রকাশ করলো, তারপরে তারা বনু গাতফান গোত্রে যায় এবং তাদেরকে খাইবারের আয় দ্বারা প্রলুব্ধ করে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করে। মোটকথা; তারা আরবের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে কুরাইশের কাফের, বনু গাতফান ও বনু সুলাইম সহ বিভিন্ন কুরাইশ ও ইহুদি আরব গোত্রকে যুদ্ধের জন্য পরাজিত করে। এভাবে সবাইকে এক প্লাটফর্মে একত্রিত করে মিত্র বাহিনী গঠন করে। মুসলমানদের জন্য এটি ছিলো অত্যন্ত কঠিন যুদ্ধ, আরবের ইতিহাসে এত বড় রক্তপিপাসু সেনাবাহিনী ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি, এটি প্রথম উপলক্ষ ছিলো, যখন আরবের সমস্ত অমুসলিমরা একত্রিত হয়ে মদীনার মুসলমানদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বের হয়েছিলো। এই বাহিনীর মোট সৈন্য সংখ্যা ছিলো ১০ হাজার। (ত্বাবক্বাতে ইবনে সা'দ, ২/৫০, ৫১)

এদিকে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় যখন এই সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের খবর পৌঁছলো তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان একত্রিত করে পরামর্শ করলেন, হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পরিখা খনন করার অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! পারস্যে যখন আমাদের অবরোধ করা হতো, তখন আমরা পরিখা খনন করতাম। আরববাসীদের জন্য পরিখা খনন করা একটি নতুন যুদ্ধ কৌশল ছিলো, সবাই এই অভিমতটি পছন্দ করলেন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। অতএব প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনায় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে বের হলেনএবং সালাহ পাহাড়ের নিচে তিন হাজার আনসার ও মুহাজির বাহিনী নিয়ে শিবির স্থাপন করেন, সালাহ পর্বতকে পশ্চাতে রেখে দ্রুতগতিতে পরিখা খননের কাজ শেষ করেন, যাতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও উপস্থিত ছিলেন। একটি মতানুসারে ৬ দিনে পরিখার কাজ শেষ হয়েছে।

সালাহ পর্বত তাঁর পিছনে ছিলো, তাঁর সামনে ছিলো পরিখা এবং পরিখা অপর প্রান্তে ছিলো শত্রু বাহিনী। (মাগাযী লিল ওয়াক্বিদী, ২/৪৪৫। ত্বাবক্বাতে ইবনে সা'দ, ২/৫১। সিরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩৯০)

ইহুদি ও মুশরিক বাহিনীর আক্রমণের পূর্বে মদীনায় বসবাসরত ইহুদিদের একটি গোত্র বনু কুরাইযামদীনার চুক্তি (হিজরতে মদীনার পর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইয়াহুদীদের থেকে একটি চুক্তি করেন) সেঅনুযায়ী ইয়াহুদীরা এই বিষয়ে বাধ্য ছিলো যে, তারা কুরাইশের কাফের এবং তাদের সাহায্যকারীদেরকে আশ্রয় দিবে না এবং মদীনায় আক্রমণ করা অবস্থায় মুসলমানদের সঙ্গ দিবে। (সিরাতে মুস্তফা: পৃষ্ঠা: ১৮৯, ১৯০) দ্বারা আবদ্ধ ছিলো, কিন্তু অবরোধের সময় বনু নদ্বীরের সর্দার হুয়ী বিন আখতাব জোরপূর্বক এই গোত্রকেও নিজেদের সাথে নিয়ে নেয়, বনু কুরাইযা একেবারে যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাথে

ওয়াদাভঙ্গ করে। খন্দক থেকে অবসর হতেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরও জবাবদিহি তলব করেন, যাকে ইতিহাসে বনু কুরাইযা যুদ্ধ বলা হয়। (সিরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩৯০)

(বনুকুরাইযার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আগামী পর্বে আসছে)

যখন মুশরিক ও ইহুদী বাহিনী মদীনা মুনাওয়ারায় আক্রমণ করে তখন সাহাবায়ে কিরামের ঈমানি সাহসিকতা এবং পরিখা তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তারা পরিখার কাছে শিবির স্থাপন করে অবরোধের উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষাব্যূহ তৈরি করে। কিছু কাফের সরু জায়গা দিয়ে পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বাহিনী সফল হলেও পরিখার অপর প্রান্তে নবীয়ে মালাহিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (এটি প্রিয় নবীর নাম, যার অর্থ যুদ্ধকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই ইরশাদ করেন: اَنَا نَبِيُّ الْمَلَاحِم (মুসনাদে আহমদ, ৩৮/৪৩৬, হাদীস: ২৩৪৪৫)) এর প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবীদের হাতে তাদের পরিণতিতে পৌঁছে। অবরোধের সময় উভয় পক্ষ থেকে হওয়া তীরন্দাজ এবং এ জাতীয় ছোটখাটো সংঘর্ষ ছাড়া যথারীতি কোন যুদ্ধ হয়নি।

(ত্বাবাক্বাতে ইবনে হিশাম, ২/৫২। সিরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩৯১)

কড়া মৌসুম, অবরোধের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হওয়া, খাদ্যদ্রব্য ফুরিয়ে যাওয়া এবং ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতার খবরের কারণে সৃষ্ট বিভ্রান্তি, এই বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই বাহিনীদের জন্য চিন্তার কারণ ছিলো (তখন হঠাৎ) আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মু'মিনদের সাহায্যের জন্য এমন তীব্র তুফান এলো যে, হাঁড়ি চুলা থেকে উল্টে গেলো, তাঁবুগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো এবং কাফেরদের উপর এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো যে, পলায়ন করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিলো না, অতএব বাহিনী প্রধান এটা বলে তার বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলো যে, আল্লাহর শপথ! পশুপাখি ধ্বংস হচ্ছে, ইহুদিরা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর এই ঝড় তো তোমরা স্বচক্ষে দেখছোই যে, না হাঁড়িগুলো চুলার উপর স্থির থাকছে, না আমরা আগুন জ্বালাতে পারছি এবং না এখানে কোন তাঁবু তৈরি করতে পারবো, তাই আমাদের অবরোধ করা নিরর্থক সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং, ارحيل ارحيل (চলো, চলো!) ধ্বনিতে মুশরিকরা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেলো এবং ইহুদীরাওতাদের দুর্গে চলে গেলো। (সিরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩৯৫। খাসায়িসুল কুবরা লিস সুয়ূতি, ১/৫৭৪)

এখন মদীনাতুর রাসূলের ভূমি এই অপবিত্র বাহিনী থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলো, অতএব ইসলামী সেনাবাহিনীও মদীনা শহরে ফিরে এলো।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের বেশি প্রাণহানি হয়নি, মোট ছয়জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন, তবে আনসারদের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, আওস গোত্রের সর্দার, হযরত সা'দ বিন মুআ'য رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তীরের আঘাতে আহত হন এবং পরে আর সুস্থ হতে পারেনি।

(সিরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৪০৩)

বনুকুরাইযার জবাবদিহিতা (বনু কুরাইযা যুদ্ধ)

মদীনা শহরের সফল প্রতিরক্ষার পর এই মিত্রবাহিনী তো পরাজিত হয়ে পলায়ণ করেছিলো, কিন্তু এখন সময় হলো চুক্তিভঙ্গকারী ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযার, যারা যুদ্ধের সময় চুক্তিভঙ্গ

করেছিলো, অতএব খন্দকের যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘোষণা করলেন যে, লোকেরা যেনো এখনো তাদেরঅস্ত্র না খুলে, বনু কুরাইযার দিকে রওনা হয়। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের দুর্গ অবরোধকরলেন, যা ২৫ দিন যাবত অব্যাহত ছিলো, অবশেষে বনু কুরাইযার লড়াকু বাহিনীদেরকে তাদের সর্দার (এই মিত্রবাহিনীর কেন্দ্রীয় সর্দার হুয়ী বিন আখতাব এবং মদীনার চুক্তি লঙ্ঘনকারী কা'ব বিন আসাদ) সহ হত্যা করে গর্তে নিক্ষেপ করা হয়, এভাবে মদীনার পবিত্র ভূমি থেকে এই ফিতনাবাজ ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিলো। (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সাদ, ৩/৩২৩ সিরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩৯৬, ৩৯৮)

মুশরিক ও ইহুদীদের পরাজয়ের কারণ:

এই যুদ্ধের সমীক্ষায় জানা যায় যে, মৌলিকভাবে এই মিত্রবাহিনীর পরাজয়ের তিনটি কারণ রয়েছে:

(১) প্রচণ্ডতুফান: যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۚ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তোমাদেরবিরুদ্ধে কিছু সৈন্য এসেছিলো, তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু ও এমন বাহিনী প্রেরণ করেছি, যা তোমরা দেখোনি এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখছেন।

(পারা: ২১, সূরা আহযাব, আয়াত: ৯)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই যুদ্ধে ফেরেশতারা কাফেরদের ভীত সন্ত্রস্ত করেছিলো এবং তাদের অন্তরে আতঙ্ক ঢেলে দিয়েছিলো কিন্তু তারা যুদ্ধ করেনি। (তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, পৃষ্ঠা: ৭৭৪)

(২) মদীনা রাজ্যের অপ্রচলিত যুদ্ধ কৌশল (Battle Strategy): পরিখা ছিলো প্রতিরক্ষার একটি পারস্য যুদ্ধ কৌশল, যা আরবের গোত্রের জন্য একটি অপ্রচলিত এবং অস্বাভাবিক কৌশল ছিলো, কারণ আরবরা তখনও রোম ও পারস্যের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখেনি। সেজন্যই তারা কোনভাবেই এর জন্য প্রস্তুত ছিলো না, তাই এই আকস্মিক আগত প্রতিবন্ধকতা তাদের নাকানি চুবানি খাইয়েছে। (দেখুন: ত্বাবাক্বাতে ইবনে সাদ, ২/৫২)

(৩) হযরত নুয়াঈম বিন মাসউদের এই বাহিনীকে উপহার: হযরত নুয়াঈম বিন মাসউদ আশজায়ী' رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বনু গাতফান গোত্রের একজন অত্যন্ত সম্মানিত সর্দার ছিলেন এবং কুরাইশ ও ইহুদী উভয়েরই তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিলো, তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু কাফেররা তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত ছিলো না, কাফের ও ইহুদীদের মধ্যে বিভক্ত করার জন্য তিনি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুমতিক্রমে প্রথমে ইহুদিদের কাছে গেলেন, তাদেরকে কুরাইশের কাফের ও বনু গাতফান থেকে তাদের কিছু সম্মানিত লোকদেরকে জামিন হিসেবে ডাকতে বললেন যে, আপনাদেরকে তো মদীনাতেই থাকতে হবে, মুশরিকদের তো কোন ভরসা নেই যে, তারা কখন মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা নয়তারা তো বহিরাগত (অর্থাৎ মক্কার বাহির থেকে এসেছে)।

তারা যদি মাঝপথে ফাঁসিয়ে দিয়ে কেটে পড়ে, তাহলে পরে তোমরা মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোকাবেলা কিভাবে করবে?

ইহুদীদের ফাঁসিয়ে দিয়ে কুরাইশ ও বনু গাতফানের কাছে এসে বললেন যে, ইহুদীরা এখন মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ধোঁকাবাজি করার কারণে অনুতপ্ত হচ্ছে এমনকি তারা মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে গোপনভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, আপনাদের কাছ থেকে কতিপয় সম্মানিতব্যক্তিত্বকেতলব করে তাদেরকে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতে তুলে দেবে, তাই তাদের ফাঁদে পড়ে নিজেদের সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে ইহুদীদের হাতে তুলে দিও না!! তারপর কি হলো, পরবর্তিতে বনু কুরাইযা যখন হযরত নুয়াঈমের কথা অনুসরণ করলো, তখন এই বাহিনীর পারস্পরিক আস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো এবং তারা একে অপরকে ধোঁকাবাজ বলে আখ্যায়িত করতে লাগলো, ফলে হযরত নুয়াঈম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বদৌলতে এই বাহিনীতে বিভক্তি দেখা দিলো, তাদের ঐক্যের কঠিন বাঁধন ছুটে গেলো। (সিরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩৯৪)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যুদ্ধে শত্রুকে ধোঁকা দেয়ার জন্য মিথ্যা বলা জায়িয, যেমনটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ অর্থাৎ যুদ্ধ বলা হয়ইপ্রতারণা করা এবং ধোঁকা দেয়াকে।

(দেখুন: বুখারী: ২/৩১৮, হাদীস: ৩০৩০। বাহারে শরীয়ত: ৩/৫১৭)

খন্দক যুদ্ধের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (Highlights)

(১) মুজিযার বহিঃপ্রকাশ: এই যুদ্ধে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক মুজিযাপ্রকাশিত হয়েছে: (১) হযরত জাবিরের দাওয়াতে একটি ছাগল ছানা ও এক সা'পরিমাণ জব, যা সেই সৈন্যরা পেট ভরে খেয়েছিলো, তবুও ততটুকু খাবারই ছিলো যতটুকু পূর্বে ছিলো। (দেখুন: বুখারী, ৩/৫২, হাদীস: ৪১০২) (২) অদ্রুপ হযরত বশীর বিনে সা'দ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কন্যা, তার পিতা ও চাচা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার নাস্তার জন্য কিছু খেজুর আনলেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই খেজুরগুলো তাঁর বরমতময় হাতে নিয়ে একটি কাপড়েছিটিয়ে দিলেন এবং খন্দক বাসীদেরকে খেতে ডাকলেন, সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে এই খেজুরগুলো খেলেন, তবুও খেজুরগুলো কাপড়ের কিনারা থেকে পড়ছিলো। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩৮৯) (৩) পরিখা খননের সময় একটি শক্ত টিলা আবির্ভূত হয় যা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ভাঙতে পারেননি, নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বরমতময় হাত দ্বারা কুড়াল মারতেই সেই শক্ত টিলা বালির উঁচু স্তূপের ন্যায়চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো। (বুখারী, ৩/৫১, হাদীস: ৪১০১)(৩) খন্দকের দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে হযরত আলী বিন হাকামের পায়ের গোড়ালি ভেঙ্গে যায়, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দয়ালু হাত সেই গোড়ালিতে বুলিয়ে দিলেন, যাতে তাঁর গোড়ালি পুরোপুরি ভালো হয়ে গেলো। (মারিফাতুস সাহাবা লিআবী নুয়াঈম, ৩/৩৭৯) (৫) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যুদ্ধ ব্যস্ততার কারণে আসরের নামায আদায় করতে পারেননিএমনকি সূর্যাস্ত হয়ে গেলো, তখন আল্লাহ পাক সূর্যকে পুণরায় ফিরিয়ে দিলেন এবং তিনি আসরের নামায আদায় করলেন।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৭/৬০০, ৪০৩৩ নং হাদীসের পাদটীকা)

(২) সাংকেতিক শব্দ (Codeword): যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিশেষ করে যখন রাতের অন্ধকারে শত্রুরা আক্রমণ করে, তখন আপন পরের ভেদাভেদ খুবই জরুরি হয়ে পড়ে যে, যেনো কোন আপনজন ধোকায় পড়ে হত্যা না হয়ে যায়, তাই চিহ্নিত করার জন্য তার জন্য বিভিন্ন শব্দ নির্ধারিত করা হতো, যা প্রয়োজনের সময় বলা হতো। খন্দকের যুদ্ধে রাতের বেলা আক্রমণ করার সময় মুহাজিরদের নিদর্শনছিলো ইয়া খাইলাল্লাহ এবং আনসারদের সাংকেতিক শব্দ ছিলো حمٓ لَا يُنْصَرُوْن ।

(মিরকাতুলমাফাতীহ, ৭/৪৯৪, ৪৯৫, ৩৯৪৮ নং হাদীসের পাদটীকা)

(৩) **পতাকাবাহী সাহাবী:** এই যুদ্ধে মুহাজিরগণের পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারিসার হাতে ছিলো আর আনসারদের পতাকাবাহী নিয়োগ করা হয় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে। (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, ২/৫১)

(৪) **আনসারদের ঈমানী উদ্যম এবং চেতনা:** যুদ্ধ কঠোরতার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আওস ও খাযরাজের সর্দার হযরত সা'দবিন মুআ'য ও হযরত সা'দ বিন উবাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর সাথে পরামর্শ করেন যে, বনু গাতফান গোত্রের সঙ্গে এই শর্তসাপেক্ষে চুক্তি করবেন যে, তারা মদীনার এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদিত ফসল নিয়ে নিবে এবং মক্কার কাফেরদের সঙ্গ ত্যাগ করবে, এ কথা শুনে তারা উভয়েই বদরের মতো ঈমানী সাহস দেখালেন এবং বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যখন আমরা কুফরে নিমজ্জিত থাকাবস্থায়তারা আমাদের থেকে একটি খেজুরও নিতে পারেননি, এখন তো আমরা মু'মিন এবং আপনার গোলাম, তাই এই চুক্তির কোন প্রয়োজন নেই, একটি জিনিস যা আমরা তাদের দিতে পারি তা হলো তরবারি। (সিরাতে ইবনে হিশশাম, পৃষ্ঠা: ৩৯১)

(৫) গুপ্তচরের বিপজ্জনক দায়িত্ব: প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই যুদ্ধে কাফেরদের খবর আনতেহযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে পাঠান। তিনি তীব্র শীতে সশস্ত্র হয়ে রওনা হয়ে গেলেন, সেখানে প্রচণ্ড বাতাস বইছিলো, নুড়ি পাথর উড়ে উড়ে মানুষের গায়ে পড়ছিলো আর চোখে ধুলো বালি পড়ছিলো, বাহিনী প্রধান গুপ্তচরের বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে ঘোষণা করলো: গুপ্তচর থেকে সাবধান থেকো! প্রত্যেকেই নিজের সাথের ব্যক্তিকে দেখে নাও! এই ঘোষণার পর প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাথের ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করতে লাগলো। হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর ডান পাশের ব্যক্তির হাত ধরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বললো: আমি অমুকের ছেলে অমুক। (সীরাত ইবনে হিশশাম, পৃষ্ঠা: ৩৯৫)

(৬) মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড: মুনাফিকরা পূর্বের ন্যায় এই যুদ্ধেও মুসলমানদের পিঠে ছুরি মারতে পেছনে থাকেনি, যেমন: (১) এই লোকেরা পরিখা খননে অলসতা করতো এবং কাজে ফাঁকি দিতো আর না বলে গোপনে বাড়ি পালিয়ে যেতো। (সীরাতে ইবনে হিশশাম, পৃষ্ঠা: ৩৮৮) (২) যখন এই বিষয়টি নিশ্চিত হলো যে, বনু কুরাইযাও শত্রুর সারিতে অন্তর্ভুক্ত, তখন ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং এই গুরুতর পরিস্থিতিতে এই লোকেরা জনসাধারণের মাঝে আপত্তিকর কথা বলে বেড়াতো যে, মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তো আমাদের কাছে ওয়াদা

করেছেন যে, আমরা কাইসার ও কিসরার ধন-ভান্ডারের মালিক হবো, অথচ এখানে তোঅবস্থা এমন যে, আমাদের কেউই আমাদের প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেও শান্তি যেতে পারে না। (সিরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩৯১) (৩) যখন কাফিরদের বাহিনী আক্রমণ করলো তখন সেই বাহিনীকে দেখা মাত্রই কাপুরুষত্বের চিহ্ন হয়ে গেলো, কিছু মুনাফিক নিরুৎসাহিত মূলক কথাবার্তা বলতে লাগলো এবং কিছু তালবাহানা উপস্থাপন করে নিজেদের ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগলো। (দেখুন: পারা: ১, আহযাব: ১৩, সিরাতুলজিনান, ৭/৫৭৭)

খন্দক যুদ্ধের প্রভাব:

কুরাইশের কাফের ও ইহুদীদের এটি এমন একটি যৌথ আক্রমণ ছিলো, যাতে ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের মনোবল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো এবং মদীনা রাষ্ট্রের প্রভাব কাফের ও মুশরিকদের হৃদয়ে এতটাই পড়লো যে, পুনরায় তারা মদীনায় আক্রমণ করার সাহস করতে পারেনি। এভাবে এটি মুসলমানদের শেষ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ হিসেবে প্রমাণিত হয়। যেমনটি প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এবার আমরা তাদেরআক্রমণ করবো, তারা নয় এবং আমরা তাদের দিকে অগ্রসর হবো, বাহিনী হত্যা করবো। (বুখারী, ৩/৫৪, হাদীস: ৪১১০)উপদ্বীপের এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে মদীনা রাষ্ট্রের জন্য দুদিক থেকে প্রতিপক্ষ খোলা ছিলো, একটি মদীনায় গোপনে ষড়যন্ত্রকারী ইহুদিদের পক্ষ থেকে এবং অন্যটি সুযোগের সন্ধানে বসে থাকা মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে, যারা বদর ইত্যাদির প্রতিশোধের জন্য অস্থির ছিলো; এই বিজয়ের সুবাদে মদীনা থেকে ফিতনাবাজ ইহুদিদের প্রত্যাহার সম্পন্ন হয়।[১] পশ্চাদে ষড়যন্ত্রকারীদের থেকে প্রাণ রক্ষা পেল এবং ভবিষ্যতে দূরদর্শিতার অনন্য হুদায়বিয়ার সন্ধির চুক্তি হয়, কুকুযার সুবাদে মক্কার মুশরিকদের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা লাভ হলো। যখন উভয় প্রতিপক্ষ থেকে আশঙ্কা কেটে গেলো এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন ইসলামের দাওয়াতের জন্য ব্যাপক ও চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেলো, ইসলামের দাওয়াতের বাগান ফুলে উঠতে শুরু করলো এবং বাহিরের রাষ্ট্র সমূহে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধি দল ইসলামের বার্তা নিয়ে যেতে লাগলো এবং প্রতিনিধিদের আসা যাওয়ার বৃত্ত প্রশস্থ হয়ে গেলো। মোটকথা বিজয়ের পর এই রাষ্ট্র উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকে; হুদায়বিয়ার সন্ধি, প্রতিনিধিদলের আসা যাওয়া এবং বিভিন্ন যুদ্ধ এবং অভিযানের মাধ্যমে এইরাষ্ট্র মক্কা বিজয়ের কঠিন পথ অতিক্রম করে অতঃপর এমন সময় এলো যে, শুধু আরবের মুশরিক বা ইহুদীরাই নয়, বাইরে থেকে আগত কাইসার ও রোম বাহিনীও এই রাষ্ট্রের সামনে দাঁড়াতে পারেনি।

---

১. মদীনায় ইহুদীদের তিনটি বড় বড় গোত্র বসবাস করতো: (১) বনু কিনকা (২) বনু নুদ্বীর (৩) বনী কুরাইযা। এই তিনটি গোত্রই অত্যন্ত ওয়াদাভঙ্গকারী ও খারাপ বাতিনের অধিকারী ছিলো বনু কিনকাকে ২হিজরীতে একজন মহিলার সতীত্বে আঘাত করার কারণে মদীনা থেকে নির্বাসিত করা হয়। বনু নুদ্বীরকে ৪র্থ হিজরীতে ওয়াদাভঙ্গ করার কারণে দেশান্তর করা হয় এবং বনু কুরাইযাকে এই খন্দকের পর, এভাবেই মদীনার পবিত্র ভূমি থেকে ইহুদীদের নির্মূল করা হয়।

মাকতাবাতুল মদীনায়

পাওয়া যাচ্ছে

বিচিত্র ঘোড়ার আরোহী

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৬৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা: ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা: আল-কারীম শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৬৪৫৪০০৫৭১

কুমিল্লা শাখা: কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৫৪৭৮১৩২৬

সৈয়দপুর শাখা: পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ সংলগ্ন, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ০১৮৭৮৪৫৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net

01180616